ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

শ্রীশ্রী গুরু—গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
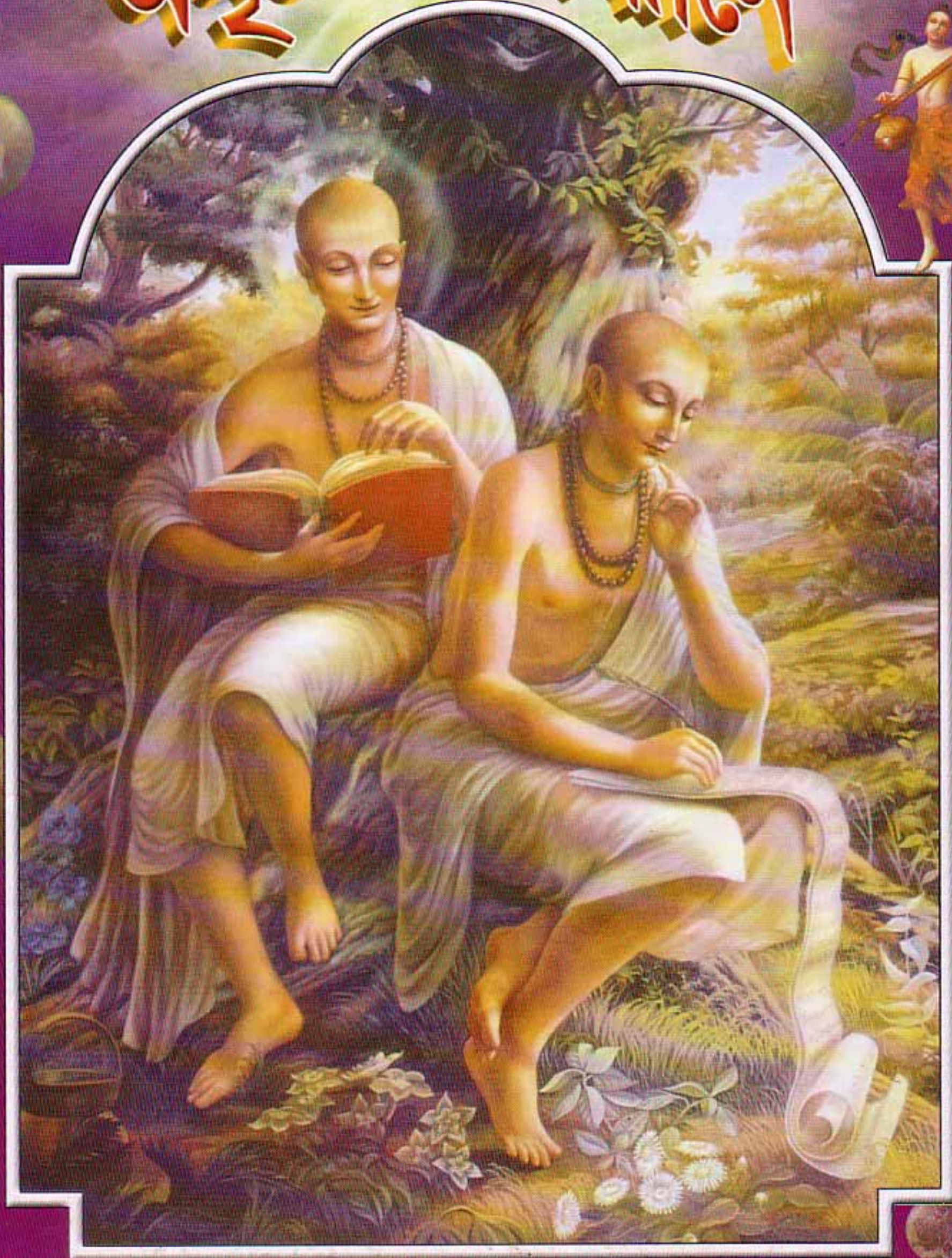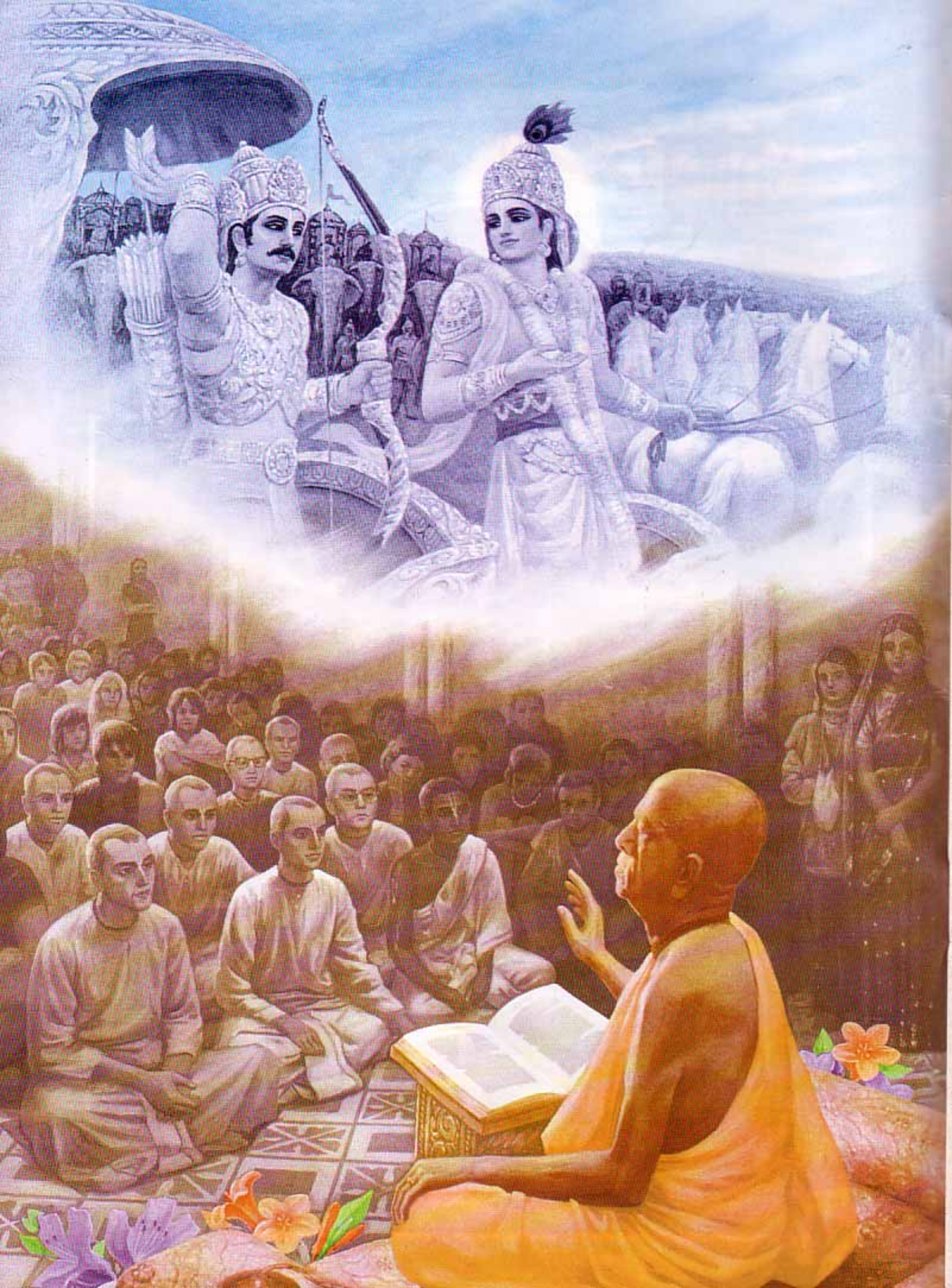
অমৃতের সন্ধানে

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দশম বর্ষ ❐ দ্বিতীয় সংখ্যা ❐ এপ্রিল ❐ মে ❐ জুন ২০০৫ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ(ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (ভারপ্রাপ্ত)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস

স্বত্বাধিকারী ঃ **ইস্‌কন্ ফুড ফর লাইফ**

ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতি কপি- ১৫.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা–
১। সাধারণ ডাকে - ৭০.০০
২। রেজিঃ ডাকে - ৯০.০০

মুদ্রণে ঃ নয়ন গ্রাফিক্‌স, ঢাকা
কম্পোজ ঃ কম্পিউটার এন্ড ডিজাইন

যোগাযোগ করুন

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড,
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট,
বনগ্রাম (ওয়ারী) ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

প্রচ্ছদ পট

ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ-শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রী সনাতন গোস্বামী। যাহারা মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন দলে অংশগ্রহন করার পূর্বে গৌড়ের বাদশা হুসেনশাহ এর মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত ছিল এবং হুসেনশাহ এর দেওয়া নাম- দবির খাঁস এবং সাকর মল্লিক নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ কৃপায় তারা হুসেন শাহ্ এর মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে স্মরন নেয়।

ক্লেশ নিবৃত্তির উপায়

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ৭ সেপ্টেম্বর নব বৃন্দাবনে প্রদত্ত ভাগবত (১/২/৯) প্রবচন

ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥

"সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরম মুক্তি। জড় বিষয় লাভের আশায় তা করা উচিত নয়। অধিকন্তু, তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, যাঁরা পরম ধর্ম অনুষ্ঠানে যুক্ত আছেন, তাঁরা যেন কখনই ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশী না হন।"

ধর্ম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। ধর্ম মানে পেশাগত বৃত্তি। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণ করছি। বর্তমানে হিন্দু ধর্ম খুবই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। বৈদিক সাহিত্যে হিন্দু ধর্ম বলে কিছুর উল্লেখ নেই। আমরা ভগবদ্‌গীতা বা ভাগবতে অথবা স্বীকৃত কোন বৈদিক সাহিত্যে হিন্দু ধর্ম বলে কিছু পাই না। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতে এই হিন্দু ধর্ম কথাটি খুবই বিশিষ্টতা লাভ করেছে। কিছুটা খিচুড়ি জাতীয়। আমাদের প্রকৃত বৈদিক ধর্ম হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে-পুরাণ, ভাগবত ও ভগবদ্‌গীতায় এবং রামায়ণ ও মহাভারতে এর উল্লেখ আছে।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, **চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ**। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, 'এই চারটি নীতি, চাতুর্বর্ণম্-চারটি বর্ণ ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ময়াসৃষ্টম্-আমার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।" কিন্তু লোকেরা ভগবানের সৃষ্টিতে আগ্রহশীল নয়। মনুষ্য-সমাজের একশ্রেণীর লোককে ব্রাহ্মণ হতে হবে, যারা শুধু জ্ঞানে আগ্রহী হবে। প্রকৃতপক্ষে তাই চলছে। মানব সমাজে কিছু লোক আছে যারা জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রচারে নিযুক্ত। তাদের ব্রাহ্মণগুণে গুণান্বিত বলে ধরে নেওয়া হয়। কারণ জ্ঞান বিতরণের অর্থ হল ভাল মস্তিষ্ক, ভাল বিদ্যা, ভাল শিক্ষার প্রয়োজন। মুর্খ, বদমাশ লোকেরা তা বিতরণ করতে পারে না। তার পরের শ্রেণী হল রাজনীতিবিদ, শাসক শ্রেণী। এরা বুদ্ধিমান শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত। সমাজকে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রাখতে তারা বন্দোবস্ত করে। পরের শ্রেণী হল বৈশ্য, উৎপাদনশীল শ্রেণী। তারা ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন, কৃষি ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করে। না হলে মানুষ বাঁচবে কি করে ? আর শূদ্রশ্রেণী-সাধারণ কর্মী শ্রেণী। এদের মস্তিষ্কও নেই, শাসন ক্ষমতাও নেই। এরা কিছু উৎপাদনও করতে পারে না। পারে শুধু কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে কাজ করতে।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রকর্ম-স্বভাবজম্।

সুতরাং এখানে আমরা আলোচনা করেছি যে, পরম মুক্তি লাভের আশায় প্রত্যেকেই তার বিশেষ ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। কারণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তনের বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হওয়া। কিন্তু আধুনিক সভ্য মানুষ বা তথাকথিত বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মানুষের এইরূপ তথ্য জানা নেই। কাজেই ভগবদ্‌গীতায় তারা মূঢ়, মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ বলে বর্ণিত হয়েছে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

আসুরি-ভাবের সাধারণ অর্থ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ। তাদের অন্য কোন উচ্চাশা নেই। আধুনিক সমাজ আসুরিভাবের বশেই চলছে। কৃষ্ণভাবনামৃত তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা শুধু ইন্দ্রিয় সুখভোগে আগ্রহী। **আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ**। বড় বড় ডিগ্রী বা উপাধি লাভ করে তারা খুব গর্বিত। কিন্তু ভগবদ্‌গীতা বলছে, **মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ**। মায়া তাদের সব জ্ঞান হরণ করেছে। তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই বলেই তাদের সব জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। মূঢ়রা পরজন্মে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে রাশিয়ায় আমি বড় বড় অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা ভাবে, "যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহ আছে চরম ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ কর"-এটা হল চার্বাকের দর্শন। বহু পূর্বে ভারতে এর চর্চা ছিল।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য কুতঃ পুনরাগমনো ভবেৎ ॥

"পর জন্মের কথা চিন্তা করছ কেন ? এই দেহ যখন পুড়ে ভস্মীভূত হবে, সবই তখন শেষ।" এটাই হল চার্বাকের দর্শন, নাস্তিক্যবাদী। সেই ধারা এখনও চলছে। চার্বাক অনুসারী লোক সব সময়েই আছে। আমি যখন রাশিয়ায় অনেক বড়

বড় অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলেছি তখন দেখেছি তাঁদের দর্শনও এই যে, "এই দেহ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ।"

সব কিছু শেষই যদি হয়ে যায়, তবে কেন তোমরা এত কঠোর পরিশ্রম করছ ? তাদের দর্শন আলাদা। তারা ভগবানে বিশ্বাস করে না, তারা পরজন্মেও বিশ্বাস করে না। এই হল অবস্থা। শুধুমাত্র কোমল মস্তিষ্ক ও ঠাণ্ডামাথার লোকই এটা বুঝতে পারে। এখন যদি আমি প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা বলি, "পরজন্ম বলে কিছু নাই," সেটা নির্ভরযোগ্য হবে না। কারণ জ্ঞান হল....ভগবদ্গীতায় পরজন্মের কথা স্বীকৃত হয়েছে। তথা **দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি**। ভগবদ্গীতার প্রাথমিক শিক্ষাই হল আত্মা অবিনশ্বর এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়। কাজেই পরজন্ম আছে এটা ভগবদ্গীতা স্বীকৃত। এটা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান। কিন্তু কেউ যদি বলে যে, "অন্য কোন জন্ম নেই," তবে সেটাকে নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যায় না। সেটা একটা নিছক সাধারণ লোকের বক্তব্য।

একজন অদক্ষ সাধারণ লোক বিভিন্নভাবে তার দর্শন প্রয়োগ করতে পারে। তাহলে সিদ্ধান্ত কি হবে ? সিদ্ধান্ত হবে এটাই যে সাধারণ লোকের চারপ্রকার ত্রুটির বাইরে যে কোন ভুল করে না, এমন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে। এমন একজন যে মোহাবিষ্ট নয়, এমন একজন যে প্রবঞ্চনা করে না, এবং যার জ্ঞানেন্দ্রিয় নিখুঁত। আমরা এই সকল গুণাবলী থেকে বঞ্চিত। আমরা ভুল করি, আমরা মোহাবিষ্ট, আমরা প্রবঞ্চক এবং একই সঙ্গে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ। কাজেই কি করে আমরা কল্পনার দ্বারা নিখুঁত জ্ঞান দিতে পারি ? সেটা সম্ভব নয়। অতএব আমাদের যে আদর্শ-বৈদিক আদর্শ সেটা পরিপূর্ণ জ্ঞান থেকেই পেতে হবে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকেরা যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ, তখন কি করে তাঁরা তোমাদের পূর্ণজ্ঞান দান করবেন ? তাঁরা শুধু কিছু বলতে পারেন, "সম্ভবত এটা এরকম হবে।" "ওরকমও হতে পারে, "এটা সম্ভবত ঐরকম ছিল।" তাঁদের মতবাদ ঐ রকম। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ভিন্ন। প্রকৃত তথ্য আমরা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে পাই। **তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি**।

ধীরঃ, যে অচঞ্চল। দুই শ্রেণীর লোক আছে ধীর ও অধীর। ধীর অর্থ অচঞ্চল আর অধীর মানে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য উন্মাদ। সুতরাং আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এত সুন্দর যে, **কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধি ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ**। এটা ধীর ও অধীর উভয়ের কাছে তৃপ্তিদায়ক। যারা শান্ত অচঞ্চল, তারা বুঝতে পারবে এই আন্দোলনটা কত বড়। আর যারা অধীর, তারাও এর প্রশংসা করবে, কারণ আমাদের কার্যসূচী খুব সুন্দর। "এখানে এসো, হরে কৃষ্ণ জপ কর, নৃত্য কর আর প্রসাদ পাও।" কে এটা গ্রহণ করবে না ? প্রকৃতপক্ষে, সকলেই এটা পছন্দ করছে, "ঠিক আছে, চল আমরা এই সংঘে যাই, কিছুক্ষণ জপ-করি, নাচ করি এবং প্রসাদ পাই।" ক্রমান্বয়ে সে চিন্ময়ধর্মী হবে, পরে উপলব্ধি করবে, তারপর সে সভ্য হবে। এটা অধীর বা চঞ্চলের পক্ষেও মনোরম বলে প্রতিভাত হবে।

সুতরাং শ্রীল সূত গোস্বামী কর্তৃক ভাগবত কথনে যাই বলা হোক ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য....প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট রূপ পেশাগত কর্মে নিযুক্ত হতে চেষ্টা করছে। মনে কর কেউ অধ্যাপক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা ডাক্তার বা অন্য কিছু। প্রত্যেককেই জীবিকার জন্য কাজ করতে হচ্ছে। এটা ঘটনা। কর্ম ছাড়া এই জড় জগতে তুমি বাঁচতে পারবে না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "তোমাকে কর্ম করতে হবে। কর্ম ছাড়া তুমি থাকতে পারবে না।" আমি বলতে চাই যে, "তোমার প্রাণ মন শরীর একত্র করে কাজ করতে হবে।" শরীর যাত্রাপি ন প্রসিধ্যেৎ। শরীরযাত্রা। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের একজন বড় ভক্ত। ভাব একবার, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলছেন এবং কৃষ্ণও ব্যক্তিগতভাবে অর্জুনকে সহায়তা করছেন। তিনি কত উন্নত। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ তাঁকে কর্ম করতে উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি কখনই বলেননি "ওহে অর্জুন, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তুমি চুপচাপ বসে থাক।" আসলে তিনিই সবকিছু করছিলেন। অবশেষে তিনি বলেছেন, **নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্** ঃ "তুমি যন্ত্রমাত্র, আমিই সব কিছু করছি।" কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের জন্য সব কিছুই করেন। কিন্তু তাই বলে এটার অর্থ এই নয় যে, ভক্ত শুধু বসে থাকবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এটা নয় যে অলস হয়ে থাকবে। কৃষ্ণের জন্যই কর্ম করবে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য নয়। সেটাকেই ধর্ম বলে।

এখানে বলা হয়েছে, **ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য**। অপবর্গ। প-বর্গের কথা সংস্কৃত ব্যাকরণে আছে-ক-বর্গ, চ-বর্গ, ত-বর্গ এবং প-বর্গ-এই পাঁচটি বর্গ। সুতরাং প-বর্গ মানে প,ফ,ব,ভ,ম এই পাঁচটি বর্ণ। প-মানে পরিশ্রম, কঠোর শ্রম। ফ-মানে ফেনা। কারণ যখন তুমি কঠোর পরিশ্রম কর, তখন তোমার মুখ থেকে ফেনা নির্গত হয়। কখনও কখনও আমরা একটা ঘোড়া বা অন্য কোন পশুর শরীরে দেখি। ব-মানে ব্যর্থতা, হতাশা। কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও এই জড় জগতে হতাশা দেখা দেয়। ভ-মানে ভয়, ভীতি। যদিও আমি কঠোর পরিশ্রম করছি, তথাপি আমার ভয় কি ঘটবে এই ভেবে। কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও আমি নিশ্চিত নই যে সব কিছু সঠিকভাবে করা হবে। প,ফ,ব,ভ এবং ম। ম-মানে মৃত্যু। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করলেও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক দুনিয়া কঠোর পরিশ্রম করছে। কিন্তু বিজ্ঞানী নিজে মৃত্যুবরণ করছে। সে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারছে না। সে মানুষ খুনের জন্য আণবিক বোমা বানাতে পারে, কিন্তু এমন কিছু বানাতে পারে না যার দ্বারা মৃত্যুকে রোধ করা যায়। সেটা সম্ভব নয়। অতএব প,ফ,ব,ভ ও ম-এই পাঁচটি বর্ণ এই জড় জগতে আমাদের পাঁচ প্রকার কাজের প্রতিনিধিত্ব করছে।

কাজেই অপবর্গ, **ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য**। একে বাতিল করবার জন্য। আর কোন কঠোর শ্রম নয়, কোন হতাশা নয়, কোন ভয় নয়, মৃত্যু নয়। সেটাই প্রকৃত সমস্যা। সুতরাং ধার্মিক হওয়া বলতে বোঝায় কিভাবে এই জড় অস্তিত্বের পাঁচটি নীতিকে বাতিল করা যায়। জড় জগতে তোমাকে অনেক অনেক কঠোর কাজ করতে হয়। এমন ভাবতে পার না যে, "ওহ আমি এত মস্তবড় লোক, আমি কাজ করব না।" ন

হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ। সিংহকে বনের রাজা বলে ধরা হয়। তবুও কিন্তু তাকে কাজ করতে হয়। এমন নয় যে সিংহটি ঘুমিয়ে থাকবে আর অন্য কোন পশু তার কাছে এসে বলবে, "হে সিংহ মহারাজ, অনুগ্রহ করে আপনার মুখব্যাদান করুন, আমি প্রবেশ করি। না, সেটা অসম্ভব। সে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হলেও তাকেও কাজ করতে হয়। ঠিক তোমাদের রাষ্ট্রপতির মতো। তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হলেও এই রাষ্ট্রপতি পদটি পাবার জন্য গর্দভ-শূকরের চেয়েও কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

কাজেই কেউ বলতে পারে না যে, "কঠোর পরিশ্রম ছাড়াই আমি কিছু লাভ করব। তা হয় না। আমাদের মতিগতি হল, আমরা কাজ করতে চাই না, সেইজন্য সপ্তাহ শেষে আমরা কিছু অবসর গ্রহন করি, শহরের বাইরে যাই এবং গোটা সপ্তাহব্যাপী কঠোর শ্রমের ধকল ভুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু সোমবারে আবার আমাদের ফিরে আসতে হয়। এমনটিই চলতে থাকে। জীব স্বভাবতই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় সে কর্মহীন জীবন উপভোগ করতে চায়। এটাই জীবের একটা ঝোঁক। ঠিক কৃষ্ণের মতো। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে, রাধারাণীর সঙ্গে লীলা উপভোগ করছেন। তিনি কোন কাজ করছেন না। তাঁর কোন কিছু করার নেই। আমরা ভাগবতে বা কোন বৈদিক সাহিত্যে শুনিনি যে শ্রীকৃষ্ণের কারখানা আছে' আর তাঁকে দশটায় অফিসে যেতে হয়, সেখান থেকে তিনি টাকা উপার্জন করেন। তারপর রাধারাণীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন। না, এমনটি শুনিনি। (হাসি) আমরা মনে করি না যে ভগবান এমন একটা বদমাশ। (হাসি) আমরা এমন ভগবানকে চাই যাঁর কিছু করার নেই। তিনিই হলেন ভগবান। **ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে।** এটাই বৈদিক তথ্য। ভগবানের করার কিছুই নেই।

তাহলে কেমন ধরনের ভগবান ইনি ? তিনি শুধু উপভোগের জন্য। এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কালী মন্দিরেও গেলেন। তিনি অনেক মন্দির দেখে যখন আমাদের মন্দিরে এলেন, তখন সেখানে তিনি রাধা-কৃষ্ণকে দেখলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "এই তো ভগবান।" তাঁর মন্তব্যটি ছিল, "আমি অন্য সব মন্দিরে দেখেছি বিগ্রহেরা কাজ করছেন। কালীদেবীও কাজ করছেন। তাঁদের হাতে কিছু না কিছু অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু এখানে তিনি উপভোগ করছেন। বেদান্ত সূত্রে ভগবানের বর্ণনা দেওয়া আছে, **আনন্দময়োভ্যাসাৎ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।**

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥

তিনি সকল কারণের কারণ হলেও, তার করণীয় কিছু নেই। এই হল বৈদিক তথ্য। উপনিষদেও তুমি দেখবে তাঁর করণীয় কিছু নেই।

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥

তাঁর সমতুল্য কাউকে দেখি না অথবা তাঁর থেকে বৃহত্তরও কাউকে দেখি না। তিনি ভগবান। ঈশ্বর মহান। মহৎ মানে কেউ তাঁর থেকে মহত্তর হতে পারে না। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, মত্তঃ **পরতরং** নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি **ধনঞ্জয়ঃ** "আমার থেকে অন্য কোন উর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষ নেই।" **অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে**-"সব কিছুর মূল আমিই।" সুতরাং অন্য দেব-দেবীগণ যেমন, শিব, ব্রহ্মা, এমন কি বিষ্ণু, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে-তাঁর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ব্রহ্মার মতো অনেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু মূল। আদ্যম, ...গোবিন্দম আদি পুরুষং তমহং ভজামি। গোবিন্দ হলেন আদি পুরুষ।

সুতরাং তাঁকে কিছুই করতে হয় না। ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে। তাঁর কোন কর্ম নেই। তাঁকে পঞ্চাশ মাইল দূরে মোটর গাড়িতে করে সত্তর মাইল বেগে কার্যালয়ে যেতে হয় না এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শেষ হতে হয় না। তাঁকে এরূপ কোন কিছু করতে হয় না, যদিও তিনি সকলের চেয়ে দ্রুত ছোটেন। ভগবদ্গীতায় ঠিক এমন কথাই বলা হয়েছে,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

সুতরাং কৃষ্ণ চিন্ময় জগতে অবস্থিত আছেন, **গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ।** আমরা তাঁকে যতদূর সম্ভব ভক্তি ও বিশ্বাস সহযোগে ভোগ নিবেদনের চেষ্টা করছি। তিনি বহু দূরে থেকেও তা গ্রহণ করছেন। অতএব এই হল ভগবানের অবস্থা। তাঁকে বিন্দুমাত্রও কোন কাজ করতে হয় না। আসন্ন কোন বিপদের ঝক্কিও তাঁকে সামলাতে হয় না। তিনি আগে থেকেই এখানে আছেন, যদিও **গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ,** তিনি গোলোকে থাকেন। এমন নয় যে কৃষ্ণ কোথাও গিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, আর গোলোক শূন্য পড়ে আছে। না, গোলোকেও তিনি আছেন। তিনি সর্বত্র রয়েছেন। **অণ্ডান্তরস্থপরমানু-চয়ান্তরস্থম্।** এই হলেন ভগবান।

ভগবানকে কোন কিছুই করতে হয় না। আর আমরা হলাম সেই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই আমাদেরও কোন কাজ না করে উপভোগ করার প্রবণতা রয়েছে। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার জন্যই আমাদের মধ্যেও সেই গুণ আছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হল আমরা কতগুলি শর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। তাই আমাদের কাজ করতে হয়। এই হল আমাদের অবস্থা। আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তাই আমাদের মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হয়, তথাপি কিন্তু আমরা সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না। আমরা সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্থ। অবশেষে এইরকম কঠোর পরিশ্রম করে আমরা মারা যাই। এই তো অবস্থা। সুতরাং ধর্ম অর্থ হল... যে কোন প্রকারের ধর্ম ও বিশ্বাস গ্রহণ করার অর্থ হল, এই পাঁচ রকমের বর্গকে বাতিল করে দেওয়া। কঠোর শ্রম, ফেনা নির্গমন, ভয়, হতাশা ও পরিণতিতে মৃত্যু। ধর্মের উদ্দেশ্য হল এটাই। ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য। ধার্মিক হওয়া মানে এই পাঁচটি নীতির মোকাবিলা করা। সেটাই ধর্ম। **ধর্মস্যহ্যাপবর্গস্য। ন অর্থায় হি উপকল্পতে**- তার মানে ধর্ম সম্পাদন করে নয়, "আমি মন্দিরে যাব আর কত কিছু চাইব। সর্বত্র খ্রিস্টানরা খাদ্য চাইতে গির্জায় যায়। "হে ভগবান, হে, পিতঃ, আমাদের নিত্যকার আহার দাও।" এটা কেমন দাবী ? ভগবান কুকুর-বিড়াল, পাখী-মক্ষী এবং সবাইকেই আহার যোগাচ্ছেন। তবে

কেন তিনি আমার আহার যোগাবেন না ? এর মানে হল তারা জানে না কি প্রার্থনা করতে হয়। **ধর্মস্যহ্যাপবর্গস্য।** "হে ভগবান, এই চতুর্বিধ দুঃখ-দুর্দশা বা যন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও।" প্রার্থনাটি এমনই হওয়া উচিত। খাদ্য চাওয়া ? এটা কেমন ধরনের প্রার্থনা ? মনে কর তুমি এক রাজার কাছে গেলে এবং রাজা তোমাকে শুধালেন, "ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে যা কিছু চাইতে পার।" আর তুমি তখন বললে, "রাজামশাই, আমাকে এক টুকরো রুটি দিন", সেটা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? যদি তুমি রাজার কাছে যাও, তবে তোমাকে এমন বলাটাই উচিত হবে, "হে প্রেমাবতার, হে মহিমাময় প্রভু, আমাকে এমন কিছু দিন যাতে আমি সকল প্রকার দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারি।" প্রার্থনাটা এমনই হওয়া উচিত। "এক টুকরো রুটি দাও", এ কেমনধারা প্রার্থনা ? অবশ্য নাস্তিক পাষণ্ডদের চেয়ে এটা ভাল। তারা ভগবান সকাশে যায় না। তারা বলে, "ওহ্ ভগবান আবার কে ? আমিই ভগবান। আর্থিক সমৃদ্ধির দ্বারা অমন কতশত রুটি আমি যোগাড় করে নিতে পরি। তবে কেন আমি গির্জায় যাব ?"

কাজেই, যারা মন্দিরে গিয়ে ভগবানের কাছে খাদ্যপ্রার্থনা করছে তারা মন্দিরে না যাওয়া নাস্তিক পাষণ্ডদের থেকে হাজার গুণ ভাল, কারণ তারা তো মোটের ওপর ভগবানের নিকটবর্তী যাচ্ছে। ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করতে হবে, তা হয়তো তারা না জানতে পারে, কিন্তু ভগবানের কাছে তো তারা যাচ্ছে। সুতরাং যারা নাস্তিক, যারা গির্জা বা মন্দিরের ধার ধারে না, সেইসব বদমাশ লোকদের থেকে এরা সহস্রগুণে ভাল। সেটাই বলা হচ্ছে। **সুকৃতিনঃ,** তারা ধার্মিক, তারা ভগবানকে মানে, তারা বলে "ভগবান আমাদের আহার যোগান।" এই তত্ত্ব তারা মানছে। কাজেই তারা ধার্মিক, তারা ধার্মিক বলে গৃহীত হয়েছে। **চতুর্বিধা ভজন্তে মাং সুকৃতিনোহর্জুন।** "যারা ধার্মিক, তারাই আমার কাছে আসে। আর্ত, অর্থার্থী, জ্ঞানী, জিজ্ঞাসু। চার রকমের লোক ভগবানের কাছে আসে। তারা সবাই ধার্মিক। প্রথমজন হল আর্ত, সাধারণ লোক, যদি সে ধার্মিক হয়, যদি সে বিপদে পড়ে, তখন সে ভগবানকে ডাকে, "পরম প্রিয় ভগবান, কৃপা করে দুঃখ কষ্ট থেকে আমায় উদ্ধার করুন।" তাকে কিন্তু ধার্মিক বলে বিবেচনা করা হয়। কারণ ত্রাণের জন্য সে ভগবানের নিকটবর্তী হয়। অর্থার্থী, যারা গরীব তারা ভগবানের কাছে টাকা-পয়সা চাইতে মন্দিরে যায়। তারাও ধার্মিক। এবং জিজ্ঞাসু, "ভগবান কি ? আসুন আমরা চর্চা করি-এই কথা যারা জানতে চান তারা দার্শনিক। জ্ঞানী, যাঁরা শিক্ষিত পণ্ডিত। সুতরাং যাঁরা ভগবানের সন্ধান করছেন, ভগবানকে বুঝতে চেষ্টা করছেন, কিছু অসুবিধার জন্য তাঁরা কাছে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে ত্রাণ চাইছেন, এই সব লোকই যাঁরা কোন না কোন কিছুর জন্য ভগবানের সন্নিকটে আসেন, তাঁরা সবাই ধার্মিক। এবং যারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নিজের জ্ঞানের দ্বারা সবকিছু সমাধানের চেষ্টা করে, তাদের সবাইকে অসুর বলা হয়। দুষ্কৃতিনঃ, দুষ্কৃতি, নরাধম, ইতর শ্রেণীর মানুষ, মূঢ় ও বদমাশ লোক এরা।

না মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ●

(১১ পৃষ্ঠার পর)

স্বয়ং গোলোকের প্রেম দান করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। সেই প্রেম পৃথিবীর অধিবাসীরা লাভ করতে পারবে, স্বর্গের দেবতা হয়ে লাভ কি! তাই প্রেম থেকে যাতে বঞ্চিত না হওয়া যায় সেজন্য দেবতারাও মহাপ্রভুর অবতরণকালে পৃথিবীতে মনুষ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করবার বাসনা করলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেদিন জন্মলীলা প্রকাশ করলেন, সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। সমস্ত নবদ্বীপ নগরের লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গার জলে নেমেছিলেন। চন্দ্রগ্রহণ সময়টি অপবিত্র সময়, তাই সেই সময়ে শাস্ত্রবিধি হচ্ছে গঙ্গার জলে নেমে স্নান করা। সেই লক্ষ লক্ষ লোক সবাই উচ্চ কলরোলে হরিধ্বনি তুলতে লাগল।

তখনকার ব্রাহ্মণরা বলতেন, হরিনাম জোরে করা যায় না। হরিনাম মনে মনে করতে হয়। সবার সম্মুখে যদি হরিনাম করা হয়-তবে অপরাধ হবে, নামের শক্তি হ্রাস পাবে, হিন্দু সমাজে অমঙ্গল হবে, বিভিন্ন অসুবিধা আছে। কিন্তু গঙ্গা ক্ষেত্র পবিত্র বলে সেখানে হরিনাম উচ্চৈস্বরে করলে বাধা নেই। শ্রীবাস ঠাকুর ভাবলেন যে,. সবাই বলে চন্দ্রগ্রহণ অশুভ, কিন্তু আমি তো শুনছি সবাই হরিনাম করছে, অতএব এটাই শুভ মুহুর্ত। সারা নগরের লোক জলের মধ্যে-সবার মুখে হরিধ্বনি। শ্রীবাস ঠাকুর বলছেন, এরকম মুহূর্ত প্রতিদিনই হোক। প্রতিদিনই লোক হরিনাম করুক। তাহলে জগতের মঙ্গল হবে।

পূর্নিমার সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতার কোলে জন্মগ্রহন করলেন। প্রতিবেশীরা সেখানে আসতে লাগল, দেবদেবীগণও অলক্ষিতে আসতে লাগলেন মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি দর্শনে। দেবদেবীরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরূপে আসতে লাগলেন।

জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র। কিন্তু মনে মনে জগৎবাসীকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ দান করতে লাগলেন। পরদিন অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা ঠাকুরাণী ঔষধী, অলঙ্কার, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে এলেন শিশু এবং তার মা-বাবার জন্য। তিনি এসে ভালভাবেই লক্ষ্য করলেন, এই শিশু চৈতন্য মহাপ্রভুর চেহারাটি হুবহু গোকুলের কৃষ্ণের মতোই। গায়ের বর্ণ ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নেই। কৃষ্ণের অঙ্গবর্ণ শ্যাম আর এই শিশুটি গৌরবর্ণ, গৌর অঙ্গ।

কৃষ্ণ এত কৃপালু,-এই কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপে এসেছেন বদ্ধজীবকে উদ্ধার করবার জন্য। আমাদের জীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। আমরা সুযোগ পেয়েছি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনে থাকতে পেরেছি। কতজন কত দূর থেকে এখানে মহাপ্রভুর জন্মতিথি উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। তাঁদের দেশে কোনও হরেকৃষ্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেনি। তবুও তাঁরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছেন। তাঁরা আনন্দেই রয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন কেবল বাঙ্গালীদেরই উদ্ধার করবার জন্যই নয়, কিংবা কেবল এই ভারতের লোকদের উদ্ধার করবার জন্যই নয়, -সারা বিশ্বকে উদ্ধার করবার জন্য। যখন শ্রীল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল ভারতে হরেকৃষ্ণ প্রচার করলেন আর বিশ্বের বাদ বাকী স্থানগুলোতে প্রচার করেন নি কেন? তখন শ্রীল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, যে যে স্থানে প্রচার হয়নি সেই সমস্ত স্থানে প্রচারের দায়িত্ব মহাপ্রভু আমাদের সবার হাতেই অর্পন করেছেন। ●

নিত্যধর্ম ও সংসার

– ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম-নামে একটা প্রাচীন বণিক্‌নগর ছিল। তথায় বহুকাল হতে সহস্র সুবর্ণবণিক্ বাস করতেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের সময় হতে সেই সকল বণিক্, প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় হরিনাম-সংকীর্তনে রত হ'ন। চণ্ডীদাস-নামক-একটী বণিক্ অর্থব্যয় হবে, এই ভয় করে নাগরিক লোকের হরিকীর্তনে যোগ দিতেন না। তিনি ব্যয় কুণ্ঠতার দ্বারা অনেক অর্থসঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর পত্নী দময়ন্তও তাঁর স্বভাব পেয়ে অতিথি ও বৈষ্ণবগণকে কোন আদর করতেন না। যৌবনাবস্থাতেই সেই বণিক্‌দম্পতীর চারিটী পুত্র ও দুইটি কন্যা হয়; কণ্যাগুলিকে ক্রমশঃ বিবাহ দিয়ে পুত্রগণের জন্য বিপুল অর্থ রেখেছিলেন। যে গৃহে বৈষ্ণব-সমাগম হয় না, তথায় শিশুগণের দয়া, ধর্ম সহজেই খর্ব হয়। শিশুগুলি যত বড় হতে লাগল, ততই তারা স্বার্থপর হয়ে অর্থলালসায় পিতামাতার মৃত্যু কামনা করতে লাগল। বণিকদম্পতীর আর অসুখের সীমা রইল না। ক্রমে পুত্রদিগকে বিবাহ দিলেন। বধূগুলিও যত বড় হতে লাগল, আপন আপন পতির স্বভাব লাভ করে কর্তা ও গৃহিণীর মরণ কামনা করতে লাগল। এখন পুত্রগণ কৃতী হয়েছে, দোকানে খরিদ বিক্রয় করে। পিতার অর্থগুলি প্রায় সকলেই ভাগ করে কার্য করতে লাগল।

চণ্ডীদাস একদিন সকলকে একত্র করে বললেন, "দেখ আমি, বাল্যকাল হতে ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবদ্বারা এত অর্থ তোমাদের জন্য রেখেছি। কখনও নিজে ভাল আহার বা ভাল পরিচ্ছদ স্বীকার করি নাই। তোমাদের জননীও তদ্রূপ ব্যবহারে কাল কাটালেন। এখন আমরা প্রায় বৃদ্ধ হলাম; তোমরা যত্নের সহিত আমাদেরকে প্রতিপালন করবে–এই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু তোমরা আমাদেরকে অযত্ন কর দেখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। আমার কিছু গুপ্ত ধন আছে, তাহা আমি যিনি ভাল পুত্র হবেন তাঁকেই দিব।"

পুত্র ও পুত্রবধূগণ মৌনভাবে ঐসব কথা শ্রবণ করে অন্যত্র একত্র হয়ে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, কর্তা ও গৃহিণীকে বিদেশে পাঠিয়ে গুপ্ত ধন অপহরণ করাই শ্রেয়। যেহেতু কর্তা অন্যায়পূর্বক ঐ ধন কাকে দিবেন, তা বলা যায় না। সকলে এই স্থির করলেন যে, কর্তার শয়নঘরে ঐ ধন পোতা আছে।

হরিচরণ কর্তার জ্যেষ্ট পুত্র। সে কর্তাকে এক দিবস প্রাতে বলল, "বাবা। আপনি মাতা ঠাকুরাণী একবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করুন–মানবজন্ম সফল হবে। শুনেছি, কলিকালে কোন তীর্থই শ্রীনবদ্বীপের ন্যায় শুভপদ নয়। নবদ্বীপ যেতে কষ্ট বা ব্যয় হবে না; যদি চলতে না পারেন, গহনার নৌকায় দুই পণ করে দিলেই পৌঁছিয়া দিবে। আপনাদের সঙ্গে একজন বৈষ্ণবী সেতো যেতেও ইচ্ছুক আছে।"

চণ্ডীদাস স্বীয় পত্নীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী আহ্লাদিত হলেন; দু'জন বলাবলি করলেন,–"সে দিবসের
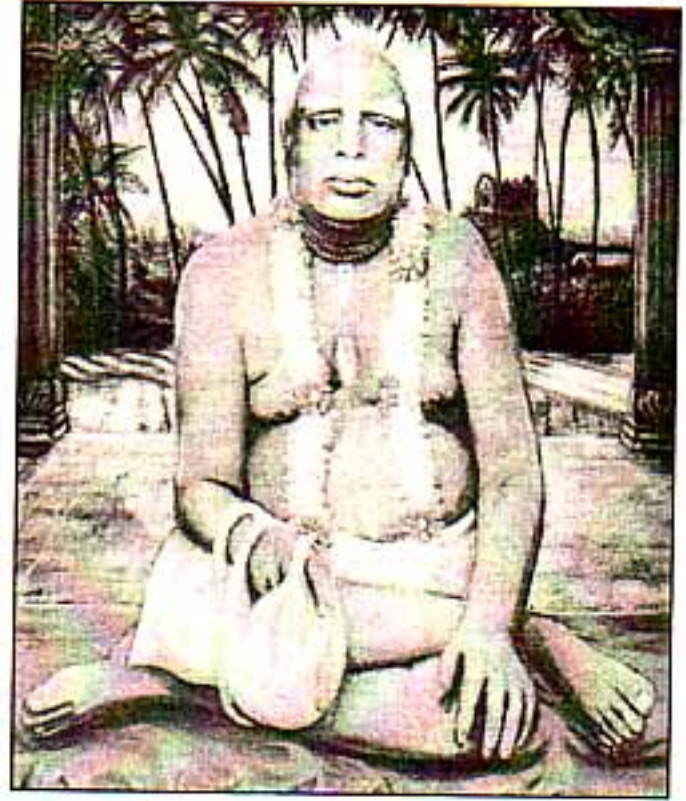
কথায় ছেলেরা শিষ্ট হয়েছে। আমরা এত অক্ষম হই নাই যে, চলতে পারি না। শ্রীপাট কালনা, শান্তিপুর হয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করব।"

দিন দেখে দু'জনে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে পরদিবস অম্বিকায় উপস্থিত। তথায় একটা দোকানে রসুই করে খেতে বসলেন, এমন সময় সপ্তগ্রামের একটা লোক বলল যে, তোমার ছেলেরা ঘরের চাবি ভেঙ্গে সমস্ত দ্রব্য নিয়াছে, আর তোমাদেরকে বাটী যেতে দিবে না; তোমার গুপ্ত অর্থ সকলে বাটিয়া নিয়াছে।

এই কথা শুনামাত্র চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী অর্থশোকে কাতর হয়ে পড়লেন। সে-দিবস আর খাওয়া দাওয়া হলো না,–ক্রন্দন করতে করতে দিন গেল। সেথো-বৈষ্ণবী বুঝিয়ে দিল যে, গৃহে আসক্তি করিও না; চল, দু'জনে ভেক লয়ে আখড়া বাঁধ। যাদের জন্য এত করলে, তারাই যখন এরূপ শত্রু হলো তখন আর ঘরে যাবার আবশ্যক নাই। চল নবদ্বীপে থাকবে, তথায় ভিক্ষা করে খাও সেও ভাল।

চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী, পুত্র ও পুত্রবধুদিগের ব্যবহার শুনে, আর ঘরে যাব না বরং প্রাণত্যাগ করব, সেও ভাল,' এরূপ বারবার বলতে লাগলেন। অবশেষে অম্বিকাগ্রামে একটী বৈষ্ণব-বাটীতে বাসা করলেন। তথায় দুই চারদিন থেকে শ্রীপাট শান্তিপুর দর্শনপূর্বক শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। শ্রীমায়াপুরে একটী বণিক-কুটুম্ব ছিল, তাঁদের বাটীতে রইলেন। দু' চারি দিন থেকে শ্রীনবদ্বীপের সপ্তপল্লী ও গঙ্গাপার এবং কুলিয়াগ্রামের সপ্তপল্লী দেখে বেড়াতে লাগলেন। কয়েক দিন পরে পুত্র পুত্রবধুগণের প্রতি পুনরায় মায়ার উদয় হলো।

চণ্ডীদাস বললেন,–"চল, আমরা সপ্তগ্রামে যাই; ছেলেরা কি আমাদিগকে কিছুমাত্র স্নেহ করবে না ?" সেথো বৈষ্ণবী

দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ' জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥

কহিল,–"তোমাদের লজ্জা নাই ? এবার তাহারা তোমাদেরকে প্রাণে বধ করিবে।" সেই কথা শুনে বৃদ্ধা দম্পতীর মনে আশঙ্কা হলো। তাহারা বলল 'বৈষ্ণব ঠাকুরুণ, তুমি স্ব-স্থানে যাও, আমরা বিবেকী হলাম। কোন ভাল লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করে আমরা ভিক্ষা দ্বারা জীবননির্বাহ করব।'

সেথো বৈষ্ণবী চলে গেল। বণিক্‌দম্পতী এখন গৃহের আশা ত্যাগ করে কুলিয়াগ্রামে ছ'কড়ি চট্টের পাড়ায় একখানি ঘর বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা শিক্ষা করে একখানি কুটীর প্রস্তুত করে তথায় রইলেন। কুলিয়াগ্রাম অপরাধ ভঞ্জনের পাট। তথায় বাস করলে পূর্ব অপরাধ দূর হয়, এরূপ একটী কথা চলে আসছে।

একদিন চণ্ডীদাস বললেন, "হরির মা ! আর কেন ? ছেলেমেয়ের কথা আর বলিও না, তাহাদিগকে আর মনে করিও না। আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ আছে, তজ্জন্যই বণিকের ঘরে জন্ম। জন্মদোষে কৃপণ হয়ে কখনও অতিথি বৈষ্ণবের সেবা করলাম না। এখন এখানে কিছু অর্থ পেলে অতিথি-সেবা করব-আর জন্মে ভাল হবে। একখানি মুদিখানা করব মানস করেছি। ভদ্রলোকদিগের নিকট হতে পঞ্চমুদ্রা ভিক্ষা করে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হব।" কয়েক দিবস যত্ন করে চণ্ডীদাস একখানি ক্ষুদ্র দোকান করে বসলেন। প্রত্যহ কিছু লাভ হতে লাগল। পতিপত্নী উদরপূর্তির পর একটী করে প্রতিদিন অতিথিসেবা করতে লাগলেন। পূর্বাপেক্ষা চণ্ডীদাসের জীবন ভাল হল।

চণ্ডীদাস একটু লেখা-পড়া পূর্বেই শিখেছিলেন। অবসর-সময়ে গুণরাজখান-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থ দোকানে বসে পাঠ করেন। ন্যায়পর হয়ে বিক্রয়াদি করেন ও অতিথি-সেবা করেন। এরূপ পাঁচ ছয় মাস গত হল। কুলিয়ার সকল লোকেই চণ্ডীদাসের ইতিহাস জানতে পেরে তাকে একটু শ্রদ্ধা করতে লাগলেন।

তথায় শ্রীযাদবদাসের স্থান। যাদবদাস গৃহস্থ-বৈষ্ণব। তিনি শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করেন। চণ্ডীদাস কখন কখন তাহা শ্রবণ করেন যাদবদাস ও তাঁর পত্নী সর্বদা বৈষ্ণবসেবায় রত থাকেন। তাহা দেখে চণ্ডীদাস ও তৎপত্নী বৈষ্ণব সেবায় রুচি লাভ করলেন।

এক দিবস চণ্ডীদাস শ্রীযাদবদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সংসার কি বস্তু ? যাদবদাস বললেন যে, ভাগীরথীর পূর্বপারে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে অনেক তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব বাস করেন; চল, এই প্রশ্ন তথায় করবে। আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়ে, অনেক প্রকার শিক্ষা লাভ করি। আজকাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের অপেক্ষা শ্রীগোদ্রুমে বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে বিশেষ নিপুণ। সে দিবস শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস বাবাজীর সহিত তর্ক করে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পরাজিত হয়েছেন। তোমার যেরূপ প্রশ্ন, তাহা তথায় ভালরূপে মীমাংসিত হবে।

অপরাহ্নে যাদবদাস ও চণ্ডীদাস গঙ্গা পার হবেন, দময়ন্তী এখন শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা করছেন। তাঁহার হৃদয়ের কৃপণতা লঘু হয়েছে। তিনি বললেন, "আমিও আপনাদের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুমে যাব।" যাদবদাস বললেন,–"তথাকার বৈষ্ণবগণ গৃহস্থ নহেন, প্রায়ই নিরপেক্ষ গৃহত্যাগী; তুমি সঙ্গে গেলে পাছে তাঁরা অসুখী হ'ন, আমি আশঙ্কা করি।" দময়ন্তী বললেন,–আমি দূরে থেকে তাঁহাদেরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করব। তাঁদের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করব না। আমি বৃদ্ধা–আমার প্রতি তাঁরা কখনই ক্রুদ্ধ হবেন না।" যাদবদাস বললেন,–"সেখানে কোন স্ত্রীলোকের যাবার রীতি নাই। তুমি বরং তন্নিকটস্থ কোন স্থানে বসে থাকবে, আমরা আসবার সময় তোমাকে নিয়ে আসব।"

তিন প্রহর বেলার পর তাঁরা তিনজনে গাঙ্গ-বালুকা উত্তীর্ণ হয়ে প্রদ্যুম্নকুঞ্জের নিকট পৌঁছলেন। দময়ন্তী কুঞ্জদ্বারে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে একটি পুরাতন বটবৃক্ষের নিকট বসলেন। যাদবদাস ও চণ্ডীদাস কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মাধবী-মালতী-মণ্ডপের উপর উপবিষ্ট বৈষ্ণবমণ্ডলীকে ভক্তিপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

শ্রীপরমহংস বাবাজী বসে আছেন। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শ্রীবৈষ্ণবদাস, লাহিড়ী মহাশয়, অনন্তদাস বাবাজী প্রভৃতি অনেকেই বসে আছেন। তাঁহার নিকটে গিয়ে যাদবদাস বসিলেন, চণ্ডীদাসও তৎপার্শ্বে বসলেন।

অনন্তদাস বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন,–"এই নুতন লোকটি কে ? যাদবদাস চণ্ডীদাসের সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন। অনন্তদাস বাবাজী একটু হাস্য করে বললেন,–"হ্যাঁ, 'সংসার' ইহাকেই বলে। যিনি সংসারকে চিনতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। যিনি সংসারের চক্রে পড়ে থাকেন তিনি শোচ্য।"

চণ্ডীদাসের মন ক্রমশঃ নির্মল হচ্ছে। নিত্য সুকৃত করলে অবশ্য মঙ্গল হয়। বৈষ্ণব-সৎকার, বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ ইত্যাদি নিত্য সুকৃত। তাহা করলে চিত্ত নির্মল হয়ে যায় ও অনন্যভক্তিতে সহজেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেদিন চণ্ডীদাস, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ের কথাটী শ্রবণ করে আর্দ্রহৃদয়ে বললেন,–আজ আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অনুগ্রহ করে আমাকে সংসার যে কি বস্তু, তাহা স্পষ্ট করে বলুন।

চণ্ডীদাস, তোমার প্রশ্নটী গম্ভীর; আমি ইচ্ছা করি, হয় শ্রীপরমহংস বাবাজী মহাশয়, নয় শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় এই প্রশ্নের উত্তরদান করুন। শ্রীপরমহংস বাবাজী প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, শ্রীঅনন্তদাস বাবাজী মহাশয়ও তদুপযুক্ত উত্তরদাতা। অদ্য আমরা সকলেই বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করব।

আপনাদের যখন আজ্ঞা পেলাম, তখন অবশ্যই আমি যাহা জানি, তাহা বলব। আমি অগ্রেই ভগবৎপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করছি–

জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়–মুক্ত-দশা ও সংসারবদ্ধদশা। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তজীব, যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হ'ন নাই বা কৃষ্ণকৃপায় মায়িক জগৎ হতে পরিমুক্ত হয়েছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত দশা। কৃষ্ণবহির্মুখ হয়ে অনাদি-মায়ার কবলে যিনি পড়ে আছেন তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার দশা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাস্যই তাঁহার জীবন। জড়জগতে তাঁহার অবস্থিতি নয়। কোন বিশুদ্ধ চিজ্জগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের নাম গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত। ●

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥

বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ইতিহাস

– শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুরে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষেএক সপ্তাহব্যাপী 'মায়াপুর ইন্সটিট্যুট অব হায়ার এডুকেশন'সংস্থায় প্রদত্ত এক বিশেষ প্রবচন থেকে সংকলিত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বৈদিক ধর্মের পুনর্জাগরণ

বৈষ্ণব শব্দটি আসছে বিষ্ণু থেকে। অর্থাৎ বিষ্ণুর যাঁরা ভক্ত বা সেবক তাঁকে বৈষ্ণব বলা হয়। বিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান। আর বৈষ্ণব হলেন ভগবানের ভক্ত। অতএব বৈষ্ণব ভগবান-থেকে আসছেন। প্রতিটি জীব হচ্ছেন বৈষ্ণব। ভগবদ্ধামে সকলেই বৈষ্ণব। জীব যখন জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখনই জীব অবৈষ্ণবে পরিণত হয়। অর্থাৎ তার বৈষ্ণব সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। তাই সৃষ্টির আদিতেই কিভাবে বৈষ্ণব হওয়া যায় ভগবান সেই পরম শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষা প্রথমে তিনি ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, এবং সেই জ্ঞানটি বেদরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভগবান সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে প্রণব বা গায়ত্রীমন্ত্র দান করেন। সেই গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার ফলে ব্রহ্মার হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসুরয়ঃ।

(ভাগবত ১/১)

সেই জ্ঞানটি ব্রহ্মার মাধ্যমে প্রকাশ হল। তাই সেটি বেদ। যেহেতু গায়ত্রী থেকে বেদের উদ্ভব হয় তাই গায়ত্রীকে বেদমাতা বলা হয়। যেমন, মাতার গর্ভে সন্তানের জন্ম হয়, তেমনি গায়ত্রীর মধ্য থেকে বেদের উদ্ভব হয়। বেদ থেকে একটি শাখার উদ্ভব হয়। বেদের আরও দু'টি শাখা আছে। একটি শাখা এই জড় জগতে প্রসারিত হয়েছে। কিভাবে জড় জগৎটিকে ভোগ করা যায়। সেই শাখাটিকে বলা হয় কর্মকাণ্ড। যখন জড় জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বা বিতৃষ্ণ হয়ে জীব মুক্ত হতে চায়, তখন বেদের যে দিকটি বা যে অংশটি সেই মুক্ত হওয়ার তত্ত্বটিকে প্রকাশ করছেন, তাকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। অতএব কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দু'টিই জড় জগৎভিত্তিক। অর্থাৎ একটি জড় জগৎ ভোগ ও অপরটি জড়জগৎ ত্যাগ। অতএব দু'টিই জড় জগৎকে কেন্দ্র করে। তাই এই দু'টিকেই জড় জগতের সঙ্গে জড়িত বলে বিচার করা হয়েছে। তাই জড় জগতের অতীত যে আর একটি শাখা প্রসারিত হয়েছে চিৎ জগতের প্রতি, সেই শাখার মাধ্যমে কেবল ভগবত-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়। সেই শাখাটিকে বলা হয় ভগবৎ-তত্ত্ব। অতএব বেদের আমরা দু'টি দিক পাচ্ছি। একটি কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের আর একটি ভগবদতত্ত্ব জ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা। ভগবদ্ ভক্তির পন্থাই হল বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বেদের উদ্দেশ্য হল ভগবানকে জানা।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥

(ভগবদগীতা ১৫/১৫)

সমস্ত বেদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞাতব্য হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেটিই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এবং সেই
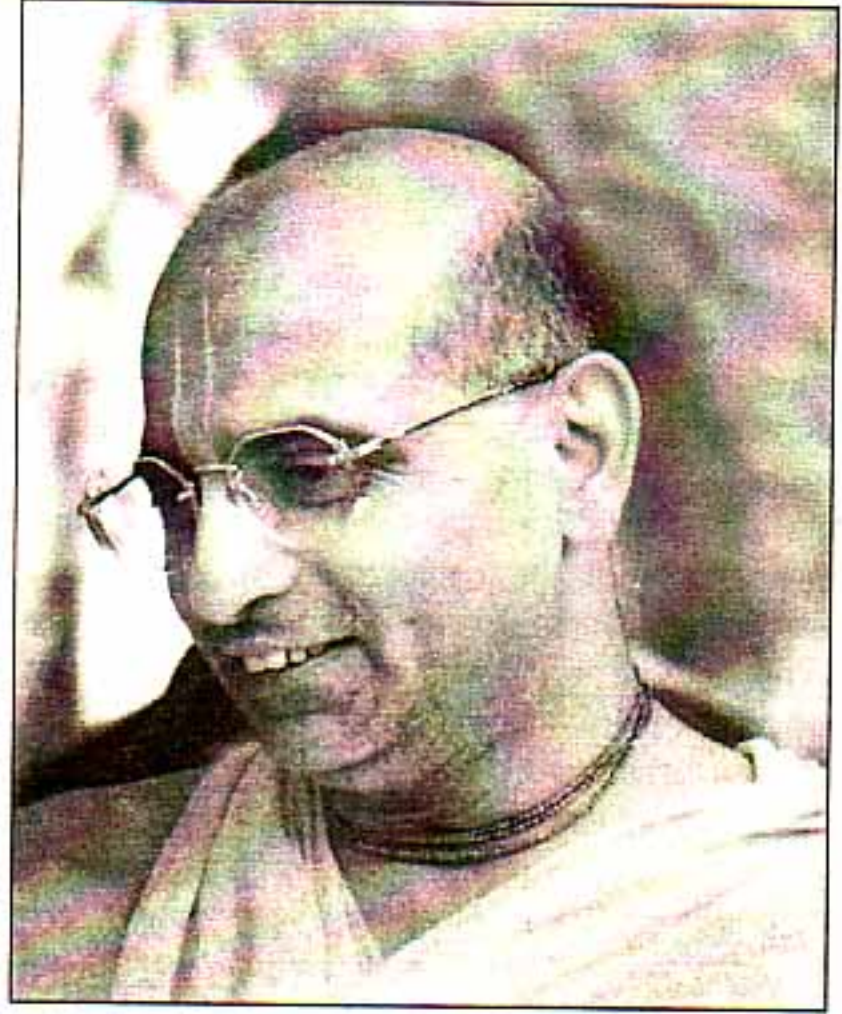
শাখাটিতে ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তির পন্থা নিরূপিত হয়েছে। সেইটি হচ্ছে ভাগবত পরম্পরা ধারা। সেই ধারাটি ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে বেদব্যাস, বেদব্যাস থেকে মধ্বাচার্য এইভাবে প্রসারিত হয়েছে। এইভাবে অনাদি কাল থেকে এই তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্‌তত্ত্ব জ্ঞান বা চিন্ময় জগতের কথা পরম্পরাক্রমে আমরা লাভ করতে পেরেছি। এই জড় জগতের উর্ধ্বে আর একটি জগৎ আছে। সেটি চিদ্ জগৎ। সেই জগৎটি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত।

অপ্রাকৃত বস্তু নহে ইন্দ্রিয় গোচর।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব বা বস্তু আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয় নয়। তা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য। অতএব সেই জিনিসটি আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন বা স্পর্শ করতে পারি না। যেমন, ভারতবর্ষে বসে, আমেরিকা কি রকম দেশ তা জানতে পারবো না। কিন্তু যে আমেরিকায় গেছে সে যদি এসে আমেরিকার কথা বলে তাহলে জানা যাবে। যে আমেরিকা ঘুরে এসেছে, সে যদি আমেরিকা সম্বন্ধে একটি বই লেখে তাহলে সেই বইটি পড়ে আমরা জানতে পারবো। ঠিক তেমনই ভগবদ্ধামের কথা বা চিৎ-জগতের কথা আমরা জানতে পারি কেবল তাঁদেরই মাধ্যমে, অর্থাৎ যারা চিৎ জগৎ দর্শন করেছেন এবং যারা চিৎ-জগৎ দর্শন করে গ্রন্থাবলী

ধর্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার। পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম সার॥

রচনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে। এখন এই চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী হচ্ছে শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্র হচ্ছে বেদ। এখানে এই যে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সেটি পরম্পরাক্রমে অর্থাৎ গুরু থেকে শিষ্য এবং সেই শিষ্য পরে গুরু হয়ে তার শিষ্যকে এই জ্ঞান দান করেছেন। এইভাবে একটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরম্পরা ধারায় এই জ্ঞান অনাদিকাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে, এবং সেই জ্ঞানটির ধারক এবং বাহক ছিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। সেইভাবেই এই জ্ঞানটি প্রবাহিত হয়ে আসছিল। কিন্তু কলিযুগের আগমনের ফলে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। কলিযুগ হল অধর্মের যুগ। ধর্ম শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের দেওয়া আইন। ভগবান যে আইনটি দান করেছেন, সেই আইনটি মেনে চলাই হচ্ছে ধর্ম। যে মেনে চলবে তার কল্যাণ হবে। আমরা ভারতবর্ষে আছি। ভারতবর্ষের আইন যারা মেনে চলবে তারা সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবে। তারা সব রকমের সুযোগ-সুবিধা, সাহায্য এবং প্রতিরক্ষা পাবে, এবং যারা আইন ভঙ্গ করবে তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। ঠিক তেমনি এই জগৎটিও হচ্ছে ভগবানের রাজ্য। এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভগবান আইন দিয়ে গেছেন, আর সেই আইনগুলি মেনে চলাই হচ্ছে ধর্ম। **ধর্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্।**

ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবানের প্রণীত আইন এবং সেই আইন যদি আমরা মেনে চলি, তাহলে জগতের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আমরা যদি আইন ভঙ্গ করি তাহলে বিশৃঙ্খলা বা অশান্তির সৃষ্টি হবে। যারা ভগবানের আইন মেনে চলে তাদের বলা হয় ধার্মিক। আর যারা মেনে চলে না তাদের বলা হয় অধার্মিক। ধর্ম আবার চারটি পা বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মের সেই পাগুলি হল–সত্য, শৌচ, তপঃ ও দয়া। সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল। কিন্তু ত্রেতা যুগে একটি পা (তপঃ) ভেঙ্গে গেল। অর্থাৎ তপস্যা হারিয়ে ফেলল। দ্বাপর যুগে দয়া এবং কলিযুগে শৌচ হারিয়ে গেল। এখন এই কলিযুগ কেবলমাত্র একটি পা বা সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমরা সত্যকেও ত্যাগ করি তাহলে ধর্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে। ধর্মের যখন একটি পা ভাঙ্গে তখন অধর্মের একটি পা গজায়। ধর্মের যখন দয়া পা-টি ভেঙ্গে গেল, তখন অধর্মের আমিষ আহার পা-টি গজালো। ত্রেতাযুগের শেষে দ্বাপর যুগে যখন তপঃ পা-টি ভেঙ্গে গেল তখন অধর্মের আসবপান বা নেশা নামক পাটি গজালো। তারপর কলিযুগের আগমনে যখন ধর্মের তৃতীয় পাটি (শৌচ) ভেঙ্গে গেল অর্থাৎ তখন অধর্মের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পাটি গজালো। এই কলিযুগে যখন ধর্মের চতুর্থ পাটি (সত্য) ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন অধর্মের দ্যুতক্রীড়া পা-টি দেখা দিচ্ছে। এই কলিযুগটি হচ্ছে অধর্মের যুগ। এখন এই অধর্মের যুগে ধর্মকে নাশ করার জন্য কলি সম্পূর্ণরূপে বেদকে নষ্ট করার পরিকল্পনা করল। কারণ বেদের উপর ভিত্তি করে ধর্ম রয়েছে। তাই কলি বেদের উপর নানা রকম অনাচারের প্রবেশ করাল বা সৃষ্টি করল। যেমন বেদের ধারক ছিল ব্রাহ্মণেরা। এখন কলিযুগকে আশ্রয় করে রাক্ষস-বৃত্তিসম্পন্ন কিছু জীবাত্মা মানুষরূপে ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করল।

রাক্ষসাঃ কলিম্ আশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।

তার ফলে বৈদিক আচরণগুলো ভ্রষ্ট হতে শুরু করল। মানুষ বেদ বা বেদের প্রতি তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলতে লাগল। এই বেদের অনাচারের ফলে, কলিযুগের প্রভাবে অসৎ আচরণ শুরু হল। যেমন কৌলিন্য প্রথা সৃষ্টি করল। কৌলিন্য প্রথা হল–কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েদের কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। আর যদি তা না হয়, তা হলে সেই ব্রাহ্মণ তার কৌলিন্য হারিয়ে জাতিচ্যুত হবে। অর্থাৎ মেয়েকে যথাযথ ব্রাহ্মণের গৃহে বিবাহ না দিতে পারলে তারা জাতিচ্যুত হবে। দেখা গেল কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম আর মেয়েদের সংখ্যা বেশী। তাই এক ব্রাহ্মণ বহু মেয়েকে বিবাহ করতে লাগলো। তারা পঞ্চাশটি গ্রামে পঞ্চাশটি মেয়েকে বিয়ে করে শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কখনও এই শ্বশুর বাড়ি আবার কখনও অন্য শ্বশুর বাড়ি। এইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শুধু তাই নয় এই সঙ্গে সতীদাহ প্রথা শুরু হল। সতীদাহ প্রথাটি বৈদিক আচরণ। বেদে তার নির্দেশ আছে। যেমন, আমরা মহাভারতে দেখতে পাই কুন্তি এবং মাদ্রী পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে দু'জনেই সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন। তখন তারা বিচার করে দেখল, "দু'জনেই যদি সহমৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমাদের এই পাঁচটি শিশু পুত্রকে দেখার জন্য কেউ থাকবে না। তাহলে আমাদের একজনকে বেঁচে থাকতে হবে।" এবং তাই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। কুন্তী বলল–"তোমার তিনটি পুত্র তাই তোমাকে থাকতে হবে। যেহেতু আমার জন্য স্বামীর মৃত্যু হল' তাই আমারই সহমৃতা হওয়া কর্তব্য।" এইভাবে তখন স্বেচ্ছায় তারা পতির সঙ্গে সহমৃতা হতেন। কিন্তু এই কলিযুগের প্রভাবে এটি প্রথাতে পরিণত হল। একে বলা হয় সতীদাহ প্রথা। অর্থাৎ পতির যদি মৃত্যু হয় তাহলে তার পত্নীকে জোর করে সেই পতির চিতার আগুণে ফেলে দেওয়া হতো। এইরকম সমস্ত নৃশংস আচরণ বেদের নামে শুরু করল এবং বেদের নামে ব্রাহ্মণেরা অসংখ্য পশুবলি দিতে শুরু করল। এইভাবে বেদের নামে অধর্মের প্রসার এতো বাড়তে লাগল যে ভগবান তখন মানুষকে বেদ বিমুখ করতে এই সমস্ত অনাচার বন্ধ করার জন্য বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হলেন।

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহ অশ্রুহত জিতং
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।

ভগবানের সদয় হৃদয় এই জীবহত্যা দর্শন করে ব্যথিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ বিধির নাম করে যে সমস্ত আচরণ হচ্ছিল, সেইগুলিকে বন্ধ করার জন্য তিনি বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ভারতবাসীদের বেদ-বিমুখ করলেন।

বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক।

বৌদ্ধরা যেহেতু বেদ মানেন না তাই তাঁরা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। সরাসরিভাবে নাস্তিক নন তাঁরা। তাঁদের আচরণ দেখে মনে হয় যেন তাঁরা ভগবানকে মানেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভগবানকে মানছেন না। এটি প্রচ্ছন্ন

নাস্তিকতার একটি দিক। আর একটি দিক হল যে, যদিও তাঁরা নাস্তিক কিন্তু যেহেতু তাঁরা বুদ্ধদেবকে মানছেন এবং যেহেতু বুদ্ধদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, তাই তাঁরা প্ররোক্ষভাবে আস্তিক। এইভাবে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাবাদ তিনি সৃষ্টি করলেন এবং বুদ্ধদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে বৈদিক অনাচারগুলি সংশোধন করলেন। তখন বুদ্ধদেবের প্রভাবে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ বেদ বিমুখ হয়ে পড়েছিল। আবার কালক্রমে আমরা দেখতে পাই যে, ক্ষত্রিয়রা বৌদ্ধ হয়ে যায়। আর সেই সময় জৈনধর্মরূপে আর একটি শাখা আস্তিকতার বানী নিয়ে প্রকাশিত হয়। জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল ঋষভদেবের থেকে। কিন্তু ঋষভদেব হলেন ভগবানের অবতার। তিনি ছিলেন পৃথিবীর রাজা এবং ভরত মহারাজ ও নবযোগেন্দ্রের পিতা। তিনি এক সময় তাঁর পুত্রদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে গৃহত্যাগী হন। তখন তিনি অবধূতের মতো সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু ঋষভদেবের আচরণ সম্পূর্ণ উন্মাদের মতো ছিল। তা সত্ত্বেও সকলেই ঋষভদেবের অনুগমন করতে শুরু করে। তা দেখে কঙ্কা ও বেঙ্কা প্রদেশের রাজা অর্হত ভাবলেন, আমি এত বড় রাজা হওয়া সত্ত্বেও তো এত লোক আমার সঙ্গে ছোটে না, এত লোক তো আমাকে মানে না। তাই আমি যদি এই লোকটির মতো আচরণ করি, তাহলে হয়তো লোকেরা আমাকে শ্রদ্ধা ও পূজা করবে। এই ভেবে রাজা অর্হত ঋষভদেবের অনুকরণ করতে শুরু করলেন। তার ফলে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। মহাবীর এসে সেই সম্প্রদায়টিকে গ্রহন করেন। জৈনরা বলে যে জৈন ধর্মের প্রবর্তক হচ্ছেন ঋষভদেব আর দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর হচ্ছেন অর্হত বা অহন্ত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋষভদেবের অনুকরণকারী অর্হত বলে কঙ্কার এবং বেঙ্কার প্রদেশের এক রাজা। কিন্তু তাঁর ধর্মটিও অনেকটা বৌদ্ধ ধর্মের মতোই অহিংসা ধর্ম। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাবীরের দ্বারা জৈনধর্মেরও প্রসার শুরু হয়। এই সময় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈশ্যদের একটা বিবাদ গড়ে উঠে। তার ফলে বৈশ্যরা জৈন ধর্মের অনুসরণ করে। আর ক্ষত্রিয়রা বুদ্ধদেবের অনুসরণ করে। যার ফলে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অহিংস হয়ে যায়। ক্ষত্রিয়রা যদি অহিংস হয়, তাহলে সমাজকে রক্ষা করবে কারা? বিদেশীর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবে কারা? এইভাবে ক্ষত্রিয় সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ অত্যন্ত ক্ষীণবীর্য হয়ে পড়ে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনাদিকাল থেকে কোন বিদেশী রাজা বা বিদেশী শত্রু ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারেনি। তারা বহুবার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু কেউ ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের রাজারাই সারা পৃথিবীর উপরে আধিপত্য করে এসেছে। পরীক্ষিৎ মহারাজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজারাই সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব করে গেছেন। সসাগরা মানে সাগর সমন্বিত কেবল স্থলভাগই নয়, জলভাগ সমন্বিত পৃথিবীর একছত্র রাজা ছিলেন। সেটি আমরা দেখতে পাই পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্ব পর্যন্ত। আর পরীক্ষিৎ মহারাজের সময় থেকেই কলিযুগের সূচনা হয়। ক্রমে ক্রমে এইভাবে যখন ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের অবক্ষয় হতে থাকে। তখন ভারতবর্ষের রাজারা অত্যন্ত হীনবীর্য হয়ে পড়ার ফলে বিদেশীরা এসে ভারতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, আজ থেকে প্রায় এক হাজার বৎসর আগেই বিদেশীরা ভারতে প্রবেশ করেছে। দশম শতাব্দীতে আফগানিস্তানের অধিবাসী পশ্‌তুভাষীদের দল, সাম্রাজ্যলোভী পাঠান সুলতান মামুদ সতেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে পাঠান সুলতান মহম্মদ ঘোরি, গিয়াসুদ্দিন তুঘলক প্রমুখ বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতীয় রাজাদের পরাজিত করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং রাজত্ব শুরু করে। আমরা দেখেছি এইভাবে কালক্রমে ভারতবর্ষ বিদেশীদের হস্তগত হয়েছে। বৈদিক ধর্মের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার ফলেই বিদেশীরা ভারতকে পরাভূত করতে পেরেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি যদি আমরা হারিয়ে ফেলি, তার ফলে আমাদের নানারকম অসুবিধাই কেবল হচ্ছে না, আমাদের সর্বনাশও হচ্ছে। আর আমাদের এই সর্বনাশ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হল আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিকে পুনরায় অবলম্বন করা। বৈদিক সংস্কৃতি বলতে বোঝায় - বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তার চরম প্রকাশ বৈষ্ণব ধর্ম। বুদ্ধদেব আসার পরেই যদিও সংস্কৃতির বিপর্যয় বা অবক্ষয় হয়েছে, তবুও একটা ভালো দিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্রমে ক্রমে সেই যে নাস্তিকতাবাদ থেকে আবার পুনরায় বেদের সংস্থাপন হলো।

প্রথমে শঙ্করাচার্য এলেন। শঙ্করাচার্য এসে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত করলেন। বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত ছিল যে, ১০টি সৎ কর্ম করাই হচ্ছে ধর্ম, আর জীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ মানে শূন্যে লীন হয়ে যাওয়া। শঙ্করাচার্য এসে বললেন-দেখো তোমরা যে-নির্বাণের কথা বলছ, সেটা তো বেদের কথা বা বেদের বানী। আর বেদে নির্বানের অর্থ শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া নয়। নির্বাণের অর্থ হল পূর্ণে লীন হয়ে যাওয়া। ব্রহ্ম কি তা তিনি প্রতিষ্ঠা করালেন। যেহেতু বৌদ্ধরা নাস্তিক, তাই পূর্ণরূপে শঙ্করাচার্য বেদের তত্ত্বটি প্রদান করলেন না। যতটুকু তাদের পক্ষে গ্রহণীয় বা শিক্ষণীয় হয়, ঠিক ততটুকুই তাদের প্রদর্শন করালেন। তিনি বললেন যে, ব্রহ্ম হচ্ছে নিরাকার, নিঃশক্তিক ও নির্বিশেষ এবং সেই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁর সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বললেন, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" জগৎ মিথ্যাটি হল- যেমন রজ্জুতে কখনও সর্পভ্রম হয় বা মরীচিকায় জল ভ্রম হয়। ঠিক তেমনই এই জগৎটি ভ্রম। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এটি তা নয়। আমাদের এই জগৎটি বাস্তব বলে মনে হতে পারে। আসলে রজ্জুতে যেমন সর্প নেই, ঠিক তেমনই এই জগতে বাস্তব বস্তুটি নেই। এই সিদ্ধান্ত দিয়ে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধদের নিরস্ত করেন। তিনি পুনরায় বেদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরে রামানুজাচার্য এসে শঙ্করাচার্যের এই যে মত, সেটিও তিনি খণ্ডন করলেন। তাঁর কয়েকটি

(১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গৌরহরির আবির্ভাবলীলা

- শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

৬ মার্চ ২০০৪ শ্রীশ্রী গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে হরিকথা প্রবচন থেকে সংকলিত

আজ গৌরপূর্ণিমা মহা-মহোৎসব। নিতাই-গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরি বোল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হলেন আজ থেকে পাঁচশো উনিশ বছর আগে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তেরো মাস-আগে মাঘ মাসে মহাপ্রভুর মা-বাবা শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র দেখলেন শ্রীঅনন্তদেব তাঁদের ঘরের ভেতরে বিরাজ করছেন। তাঁর হাজার হাজার মুখে দিব্য বেদস্তুতি প্রকাশ করছেন। তিনি হাজার মুখে একই সঙ্গে সমস্ত বেদমন্ত্র পাঠ করছিলেন।

ভগবান এখানে অবতীর্ণ হবেন এই জন্যে অনন্তদেব সেই স্থান এভাবে পবিত্র করতে লাগলেন। ভগবান যখন অবতীর্ণ হলেন তখন তিনিও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের শরীর জ্যোতির্ময় হয়েছিল। সেই জ্যোতিতে ঘর দুয়ার ভরে গেল। জ্যোতির্ময় হওয়ার কারণটি হল জগন্নাথমিশ্রের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিরাজ করছিলেন।

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

জগন্নাথমিশ্রের হৃদয়ে শচীনন্দন গৌরহরি বিরাজ করছেন। সেইজন্য তাঁর শরীর থেকে দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছিল। সেই সময়টিতে জগন্নাথ মিশ্র শয়নকালে দিব্য স্বপ্ন দেখলেন, বৈকুণ্ঠ-ধাম এসে তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করল। তারপর দেখলেন সেই ধাম তাঁর হৃদয় থেকে শচীদেবীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হল।

বেদশাস্ত্রে বলে তমো, রজো ও সত্ত্ব গুণের উর্ধ্বে শুদ্ধসত্ত্ব স্তর। যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁকে বলা হয় বসুদেব। বসুদেবস্তরের ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হন। সেই রকম শুদ্ধ অবস্থা না হলে ভগবান সেখানে আবির্ভূত হবেন না।

আপনারা কয় জন চান যে, ভগবান আপনাদের হৃদয়ে থাকবেন? (কয়েকজন হাত তুলে বললেন 'হরিবোল') সবাই চান না। তাই হাত তুলছেন না। (তারপর সবাই হাত তুললেন এবং 'গৌরাঙ্গ-হরিবোল' বলতে লাগলেন) সাধারণ কথা হল আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে আনতে হলে আগে আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে হবে। ভাগবানের নাম গ্রহণ, ভগবানের সেবা, ভগবানের সাধনা দ্বারা চেষ্টা করব আমাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করে তুলতে যাতে ভগবান আমাদের হৃদয়ে আসতে পারে। হৃদয়ে ভগবান যাতে অবস্থান করতে পারেন। জগন্নাথমিশ্র ও শচীমাতা আমাদের মতো বদ্ধ জীব নন। তাঁরা নিত্য সিদ্ধ ভক্ত। জগন্নাথ মিশ্র বসুদেবের অভিন্ন স্বরূপ। তাঁর হৃদয় শুদ্ধ। শচীদেবীও তাই। আমরা চাই আমাদের হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত হোন, তাই আমাদের চেতনা শুদ্ধ করতে হবে। হরিনামের দ্বারা চেতনা মার্জিত ও শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হলে তখন ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারব। জগন্নাথ মিশ্র সাধারণ জীব নন। তিনি গোলোক বৃন্দাবন থেকে নেমে এসেছেন। কৃষ্ণলীলার অধিকাংশ ভক্তই গৌরলীলায় অংশগ্রহন করেছেন। আমরা বদ্ধ জীবেরাও ভগবানের নিত্যলীলায় যুক্ত হতে পারি, যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে হরিনাম করি, ভগবানের সেবা করি, যদি ঐকান্তিক ভাবে আকাঙ্খা করি–ভগবানের নিত্য লীলায় যুক্ত হব। ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করতে পারলে আমাদের হৃদয়ে ভগবান অধিষ্ঠিত হবেন।

কৃপাসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ এই তিন ধরনের ভক্ত আছেন। যাঁরা গোলোক ধাম থেকে এই জগতে লীলা করতে এসেছেন তাঁরা নিত্যসিদ্ধ। সাধনা ছাড়াও ভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হয়ে সিদ্ধ হয়েছেন এমন ভক্ত কৃপাসিদ্ধ। আর যাঁরা ভগবদ্ পাদপদ্ম লাভের জন্য সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা সাধনসিদ্ধ। কে কি ধরনের সিদ্ধ ব্যক্তি হয়েছেন, তাতে কোনও যায় আসে না। যদি আমরা পরম সিদ্ধি লাভের জন্য ঐকান্তিক হই, তবে এই জীবনের অন্তিমে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেখানে গৌরলীলা চলছে। সেখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাকীর্তন দলের মধ্যে আমরা যুক্ত হতে পারব কিংবা অন্য কোনও বিশেষ সেবা আমরা পেতে পারব। এই হচ্ছে ভক্তি জগতের সাধারণ নিয়ম। এই পৃথিবী থেকে সরাসরি গোলোক বৃন্দাবনে না গিয়ে সাধারণত যে ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণলীলা চলছে কিংবা গৌরলীলা চলছে সেই ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে সেই লীলায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারব। তারপরে সেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে গোলোকে উপনীত হতে পারব।

পরদিন জগন্নাথ মিশ্র দিব্য স্বপ্নের কথা শচীদেবীকে বললে শচীদেবীও জানালেন, "আমি স্বপ্ন দেখলাম, আপনার হৃদয় থেকে দিব্য জ্যোতির্ময় একটি ধাম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দেবতারা আমার দিকে তাকিয়ে কি সব স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনা করছে।

এই জগতে লোকে ধর্মাচার করছে নিজের কিছু জড়জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবার উদ্দেশ্যে। ভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্য কেউ কিছু করছে না। ভক্তদের পক্ষে এরকম পরিস্থিতি বিপজ্জনক। দেবতারা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, স্বর্গের দেবতা হয়েও তাঁরা অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছেন। প্রথমত, পৃথিবীর তুলনায় সেখানে অনেক বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বহুকাল সুখভোগ করার ফলে ভগবানকে বিস্মৃত হয়েই থাকা হয়। দ্বিতীয়ত, দৈত্য দানবেরা প্রায়ই স্বর্গলোক আক্রমণ করে থাকে এবং দেবতাদের উৎপীড়ন করতে থাকে।

তৃতীয়ত, স্বর্গলোক থেকে সহজে ভগবৎপ্রেম লাভ করে জড়জগতের অতীত বৈকুণ্ঠ গোলোকে যাওয়া যায় না। ভগবান

(৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধর্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ'। কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥

এখন কি হবে ?

- শ্রীল সৎ-স্বরূপ দাস গোস্বামী

কতবার কত লোক আমাদের প্রশ্ন করেছে, "কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের গুরুরূপে কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে ?" কতবার কতলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে, "শ্রীল প্রভুপাদের অবর্তমানে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ভেঙ্গে পড়বে না তো ?"

সেই সম্বন্ধে সবার আগে বলতে হয়, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের স্থান কেউ পূর্ণ করতে পারবে না। কেবল ভোট দিয়ে কোন মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মার পদে অধিষ্ঠিত করা যায় না।

বৈদিক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে যে, গুরু পরম্পরা তার উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্ত ভক্তদের শ্রদ্ধা করার। তবে কখনও কখনও সমস্ত জগৎ উদ্ধারকারী জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব হয়, যাদের স্থান অন্য কেউ পূর্ণ করতে পারে না। যেমন, একাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য, দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য, ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন, এবং মানুষ আজও তাঁদের অনুসরণ করেন এবং পূজা করেন। এইরকম মহাপুরুষদের আবির্ভাব কদাচিৎ হয়। তবুও নিষ্ঠাবান ভক্তরা গুরুরূপে ভগবদ্ভক্তির বীজ জীবের হৃদয়ে রোপন করে পরম্পরা ধারা বজায় রাখেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকায় আসার পঞ্চাশ- ষাট বছর আগে থেকেই–ভারতের তথাকথিত সমস্ত স্বামী এবং যোগী, বৈদিক দর্শন এবং ধর্ম শিক্ষা দেয়ার নামে এখানে এসেছেন, কিন্তু তাঁরা একটি মানুষকেও কৃষ্ণভক্তে পরিণত করতে পারেন নি। শ্রীল প্রভুপাদের মতো তাঁরাও এখানে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভগবদ্গীতা প্রচলন করেছেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের মতো তাঁরা যথাযথভাবে, বিশুদ্ধভাবে, তা প্রদান করতে পারেন নি, কেননা তাঁরা ভগবদ্গীতার বক্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্ত নন। এই যুগের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভগবানের দিব্য নাম পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। ১৯৬৫ সালে শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকা আসার পর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদের করুণা, বুদ্ধিমত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে পূর্ণ শরণাগতির ফলে পাশ্চাত্যের মানুষেরা এই অমূল্য সম্পদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান প্রমাণ করে যে, সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবৎ-প্রেম প্রচারের জন্য তিনি ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়েছিলেন। এরকম জগদ্‌গুরুর আসন কেউ পূর্ণ করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ জল্পনা কল্পনা করে চলে। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছু পূর্বে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে 'বিশেষজ্ঞ' জনৈক পণ্ডিত এ্যানথ্রোপলজিষ্ট, মন্তব্য করেছিলেন যে শ্রীল প্রভুপাদ যে কাকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মনোনয়ন করেছেন, তা এখন তিনি গোপন রেখেছেন। তবে তাঁর তিরোভাবের পূর্বে তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করবেন। সে কথাটি সত্য নয়। শ্রীল প্রভুপাদ কোন একজন বিশেষ ব্যক্তিকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করেন নি।

তাহলে ইসকন–আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ–চলবে কি করে ? তার উত্তর হচ্ছে যে, তিনি সারা পৃথিবীজুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার পূর্ণ আয়োজন করে গেছেন। ১৯২৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ ২৪ জন নেতৃস্থানীয় ভক্তদের নিয়ে একটি গভর্নিং বডি কমিশন (G.B.C) গঠন করেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসকনের প্রচার কার্য পরিচালনা করার জন্য। এই জি.বি.সি–দের শ্রীল প্রভুপাদ নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন (কারো কারো ক্ষেত্রে দশ-এগার বছর ধরে)।

বহু বছর ধরে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের কার্যকলাপ পরিচালনা করে আসছেন, এবং তাঁরা এখন সেই কাজ চালিয়ে যাবেন। প্রতি বৎসর G.B.C–রা শ্রীধাম মায়াপুরে মিলিত হন এবং তাঁরা সমবেতভাবে পরিকল্পনা করেন, কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাকে রূপদান করা হবে।

আর তাছাড়া, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর অপ্রকটের পূর্বে তাঁর এগারজন নেতৃস্থানীয় শিষ্যকে দীক্ষাগুরু রূপে নিযুক্ত করে গেছেন, যাঁরা তাঁর অপ্রকটের পর শিষ্য গ্রহণ করতে পারবেন। এইভাবে তিনি পরম্পরা ধারা যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করে গেছেন।

গুরু হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই শাস্ত্রের এই শ্লোকটি উল্লেখ করতেন–'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' তিনি ব্রাহ্মণ, না সন্ন্যাসী, না শূদ্র, কিছু যায় আসে না। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য।' শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি শিষ্যই যেন শুদ্ধ ভক্ত হয়, আদর্শ গুরু হয় এবং জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পারমার্থিক স্তরে উন্নীত করে অমৃতত্ত্ব দান করে। এইভাবে, শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবী জুড়ে যে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করে

গেছেন, সেই কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য একজন নয়, অসংখ্যা গুরু নেতৃত্ব দান করবেন।

আমাদের পরম প্রিয় গুরুদেব এবং পথ-প্রদর্শকের অবর্তমানে, আমাদের এই কথাগুলি হয়তো আশাবাদের মতো শোনাচ্ছে। হ্যাঁ, সে কথাটি সত্যি। আমাদের পরম আরাধ্য গুরুদেবের অপ্রকটে যদিও আমরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি, তবুও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাণী অনুসরণ করে যাব, ততক্ষণ আমরা আমাদের কাজে সফল হব। এই বিশ্বাসটি কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের একটি নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত–গুরুদেবের অবর্তমানে, শিষ্য তাঁর বাণী অনুসরণ করার মাধ্যমে, তাঁর সেবা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে লিখেছেন, "গুরুদেবের সেবা করা অপরিহার্য। যদি সরাসরিভাবে গুরুদেবের সেবা না করা যায়, তাহলে শিষ্যের উচিত তাঁর বাণী স্মরণ করে তাঁর সেবা করা। গুরুদেবের বাণী এবং বপুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই তাঁর অবর্তমানে তাঁর বাণী হচ্ছে শিষ্যের গৌরব।"

তাই, শ্রীল প্রভুপাদের অবর্তমানে, আমরা– তাঁর শিষ্যরা, তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার ব্যাপারে আরও বেশী ঐকান্তিকতা অনুভব করছি, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে প্রচার করতে আরও বেশী বদ্ধ-পরিকর বলে অনুভব করছি। তিনি কখনও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভার ভিত্তিতে আমাদের নির্দেশ দেন-নি। পক্ষান্তরে, তিনি সবসময় আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, পরম্পরা-লব্ধ শাস্ত্রবাণীর কোনরকম পরিবর্তন সাধন না করে তা প্রদান করতে। আমরা সবসময় বুঝতে শিখেছি যে, তাঁকে সেবা করার মাধ্যমে আমরা পূর্বতন সমস্ত আচার্যদের সেবা করছি, এবং তাঁদের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছি।

ইস্‌কনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচনা, কোনও সংকীর্ণ ধর্মমতের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের আলোচনার সমপর্যায়ভুক্ত নয়। সমগ্র মানবসমাজ এবং সমগ্র পৃথিবীকে কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ যা দান করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার সাফল্যের বিচার হবে। এটি কোন সংকীর্ণ ধর্মমত নয়। এটি হচ্ছে সার্বজনীন আত্মার বিজ্ঞান।

বৈদিক শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এবং আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান যুগের নেতারা মানব-সমাজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই উন্মত্ততা যত বাড়বে, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষেরা ততই এই দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত যুগে একমাত্র আশার আলোক শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘকে তাদের একমাত্র আশ্রয় বলে জানতে পারবে। ●

(১০ পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টান্ত এই রকম যে, শঙ্করাচার্য বলেছেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" যেমন, রজ্জুতে কোন সর্প ভ্রম হয়, তেমনই এই জগৎটা ভ্রম। রামানুজাচার্য বললেন, ঠিক আছে রজ্জুতে সর্প নেই মানলাম। কিন্তু কোথাও না কোথাও সর্প আছে বলে ভ্রম হচ্ছে। যদি সর্প না থাকতো তাহলে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের কোন প্রশ্নই উঠত না। অতএব এই জগৎটি যাকে আমরা বাস্তব বলে মনে করছি সেটি বাস্তব নাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জগৎটি কোথাও রয়েছে বলেই এই জগৎটিকে আমরা বাস্তব বলে মনে করছি। এইভাবে তিনি শঙ্করাচার্যের মত খণ্ডন করে প্রতিষ্ঠা করলেন, এই জড় জগতের উর্দ্ধে আর একটি জগৎ রয়েছে। এই জগৎটি হচ্ছে সেই জগতের প্রতিবিম্ব। এই জগতে যা কিছু রয়েছে তা সব ঐ জগতেও রয়েছে এবং ঐ জগৎটি বাস্তব, এবং এই জগৎটি তার ছায়া। এবং ছায়ারূপে এই জগৎটিও সত্য, মিথ্যা নয়। যেমন, জলে যদি গাছের ছায়া পড়ে, তাহলে জলে যা কিছু দেখা যায়, গাছটিতে সেই সবকিছু রয়েছে বলেই দেখা যাচ্ছে। যদি গাছটিতে সবুজ পাতা আর লালফুল না থাকতো, হলুদ ফল না থাকতো তাহলে জলে লাল ফুল, হলুদ ফল দেখা যেতো না। সেই জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন-এই জগতের যে বৈচিত্র্য তা ঐ জগতেও রয়েছে। এইভাবে তিনি শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদের পরিবর্তে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর মধ্বাচার্য এসে আরও দৃঢ়ভাবে তার ব্রহ্ম মধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই জগতে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই যে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং বৈষ্ণবদের দ্বৈতবাদ তার মধ্যে একটা সংঘর্ষ গড়ে উঠেছিল। অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসে তাঁর অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের মাধ্যমে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং বৈষ্ণব আচার্যদের দৈতবাদের সমন্বয় সাধন করলেন। তিনি বললেন যে, গুণগতভাবে ব্রহ্ম জীব এবং প্রকৃতির মাঝে ঐক্য বা অভেদ রয়েছে, কিন্তু আয়তনগতভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, জীব এবং ঈশ্বর। গুণগতভাবে জীবও সচ্চিদানন্দময়, ভগবানও সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু আয়তনগতভাবে জীব ক্ষুদ্র, ভগবান পূর্ণ। যেমন, সমুদ্রের জল এবং একবিন্দু জল। কিন্তু কেউ যদি বলে যে একবিন্দু জলটাই সমুদ্র তাহলে সেটা ঠিক হবে না। ঠিক যেমন, আগুনের স্ফুলিঙ্গও আলো এবং সূর্যের কিরণও আলো। কিন্তু আমরা কিরণ ও আগুনের কনাকে কি সুর্য বলি ? গুণগতভাবে এক হলেও আয়তনগতভাবে আলাদা। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটি অচিন্ত্য ; চিন্তার অতীত। অতএব অচিন্ত্য তত্ত্বটি বা বস্তুটি যদিও অচিন্ত্য, তবুও তার মধ্যে ভেদ এবং অভেদ দু'টিই রয়েছে। একদিকে ভেদ রয়েছে আর একদিকে অভেদ রয়েছে। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের মাধ্যমে বেদের পূর্ণ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করলেন। (চলবে)

ছাত্র বা বিদ্যার্থীদের ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রসংঙ্গে

-শ্রী পুষ্পশীলা শ্যামদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, বর্নাশ্রম ধর্ম অথবা সনাতন ধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, মানব জীবনের সর্বোচ্চ লাভ যৌন জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করা। কেননা মৈথুনের প্রতি আসক্তির ফলে জন্ম-জন্মান্তরে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়। যেই সভ্যতা মানুষকে যৌন জীবন নিয়ন্ত্রন করার শিক্ষা দেয় না, তা নিকৃষ্ঠতম সভ্যতা, কেননা সেই পরিবেশে জড় দেহের বন্ধন থেকে আত্মার কখনও মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। জন্ম-মৃত্যু, জড়া ও ব্যধি জড় দেহের সঙ্গেই কেবল সম্পর্ক আছে, তাদের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগের দৈহিক আসক্তি বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা জড়দেহে জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে বাধ্য হয়।

জড় দেহকে বস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যা কালক্রমে জীর্ন হয়ে যায়। আর এই শিক্ষা পাঁচ বছর সময় থেকে শিশুদের গুরুকূলে গ্রহণ করতে হতো। তাদেরকে আচার যুক্ত হয়ে কঠোর আত্ম সংযম করতে হত, আর সেই আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান আরাধিত হতেন। বিষ্ণুপুরানে বলা হয়েছে-

"বর্ণাশ্রমাচরবতা পুরুষেন পরপুমান্।
বিষ্ণুরা রাধ্যতে পন্থা নান্যত্ত তোষকারনম্ ॥"

অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বর্ণ, ধর্ম ও আশ্রম ধর্মের আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা আরাধিত হন। বর্ণাশ্রম আচার ব্যতীত তাঁকে পরিতুষ্ঠ করার অন্য কোন উপায় নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল নারদ মুনি বলেছেন-

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরুর্হিতম্।
আচরন্ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥"

ভাঃ ৭/১২/০১।

অর্থ্যাৎ বিদ্যার্থীর কর্তব্য পুর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করার মাধ্যমে বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ন হওয়া এবং দাসবৎ আচরন করা। এভাবে মহানব্রত সহকারে কেবলমাত্র শ্রী গুরুদেবের হিত সাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাস করা উচিত। এই প্রথা সনাতন ধর্মের সুপ্রাচীন বৈদিক প্রথা এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা, যে সভ্যতা আজ সম্পূর্নভাবে হারাতে বসেছে। ছাত্র বা শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মচর্য চরিত্র গঠনের সামাজিক বা পারিবারিকভাবে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। বর্তমান তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা এবং ছাত্র বা যুবকদের বদ্ধ ধারনা পিতামাতা দাদু-দিদিমা বেঁচে থাকতে ধর্ম-কর্ম তাদের কিছুই করতে হবেনা। আর এ ধারনাটাই ছাত্র সমাজকে পারমার্থিক জ্ঞানশূণ্য করে মূলবান মনুষ্য শরীর নষ্ট করা শেখাচ্ছে। এ যে কি সর্বনাশ তা বলা বাহুল্য।

তখন তারা যৌবনের উত্তেজনায় অস্বাভাবিক ভাবে শুক্রক্ষয় করে নিজেদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলছে। তারা দীর্ঘ দিন ধরে যৌন অত্যাচারে নানা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যেমন, পুরুষত্বহীনতা, মেহ, প্রমেহ, হাঁপানী, অজীর্ন, শিরপীড়া, আলস্য, কর্মদক্ষতাহীন রুগ্ন শরীরে সাময়িক সুখের আশায় যৌন জীবনে পদার্পন করে মূল্যবান মনুষ্য জীবনকে অনন্ত অশান্তির শেষ প্রান্তে পৌছে দিচ্ছে।

ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালন শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শুক্র রক্ষা দ্বারা ছাত্রদের জাগতিক বা পারমার্থিক কোন কালের কল্যান সম্ভব নয়।

যেমন, পাগলা হাতি সুবিন্যস্ত কলার বাগানকে তছনছ করে ফেলে। তদ্রুপ আজকের ছাত্র সমাজ বা যুবশক্তি যৌন উত্তেজনায় সনাতন ধর্মের সাজানো গুছানো বর্ণাশ্রম সমাজ ও বৈদিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ফেলছে। তারা জানে না, রিপু এবং যৌবন এসব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দান, এর সৌন্দর্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবেদন করা উচিত। তখনই যৌবনের সার্থকতা।

"প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাসং নিবৃত্তিস্ত মহাকলম্ ॥
মনু সংহিতা

অর্থাৎ এই জড়জগতে সকলে প্রবৃত্তি মার্গের প্রতি আসক্ত হয়। কিন্তু নিবৃত্তি মার্গের অনুগমন করেই মহত্তম সম্পদ লাভ করা যায়। বিশ্ববন্দিত শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে, এই জড়জগতে আমাদের প্রবনতা থাকতে পারে, কিন্তু মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই সকল প্রবনতাকে প্রশমিত করা। এই দেহ বদ্ধ অপূর্ণ জীবনে প্রবনতা দ্বারা তাড়িত না হয়ে, শাস্ত্র অনুসারে জীবন-যাপন করা উচিত। আজ সুশিক্ষার অভাবে ছাত্র বা যুব সমাজ, পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি সহনশীল বা ভক্তিশীল নয়; সৎ-শিক্ষাহীনতায় তারা কু-শিক্ষার চরম স্থান দখল করে চলেছে। পিতার কর্তব্য শুধু ছেলের ভরন পোষন দানে খান্ত হওয়া নয়, মাতার শুধু স্তন দানের মাধ্যমে সন্তানকে বড় করা শেষ কর্তব্য নয়। পশুরাও স্তন দানের মাধ্যমে তাদের সন্তানকে বড় করে। কিন্তু পশুরা তাদের সন্তানদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করতে পারে না।

বরং একোগুণী পুত্রো ন চ মুর্খশ তৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্ত যো হান্তিন চ তারা গনৈরাপি ॥

চানক্য পন্ডিত

অর্থাৎ শতশত মূর্খ সন্তান লাভ করার থেকে একজন গুনী পুত্র লাভ করা ভাল। কারণ অসংখ্য তাঁরা অন্ধকার দূর করতে পারেনা। কিন্তু একটি মাত্র চাঁদ ব্রহ্মান্ডের অন্ধকার দূর করে।

যদি পিতামাতা বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে শুদ্ধ জীবন যাপন না করে, তাহলে শিশুর মানসিক অবস্থা পিতামাতার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে -

যথাজীবনম্ যথাযোগী ॥

অর্থাৎ যেমন পিতামাতা তেমনই সন্তান। চানক্য পন্ডিত আরও বলেছেন -

"কোহর্থং পুত্রেন জাতেন যোন বিদ্বান্ ন ধার্মিক।

কানেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুর পীড়ৈব কেবলম্ ॥"

অর্থাৎ যে পুত্র ধার্মিক নয় বিদ্ধান নয়, সে পুত্রের কি মূল্য ? সেই রকম পুত্রকে শুধু একটি কানা চোখের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যা কেবল যন্ত্রনাই দান করে। তাই প্রতিটি পিতামাতাকে সন্তান জন্ম দেওয়ার আগে ভাবতে হবে। সন্তানের মধ্যে আধ্যাতিক জ্ঞান দান করতে পারবে কি না ? বেদে বলা হয়েছে–তুমি শত পুত্রের পিতা হতে পার, কোন আপত্তি নাই–যদি পারমার্থিক জ্ঞান সন্তানের মধ্যে দান করতে পার। কিন্তু যদি পারমার্থিক জ্ঞান দান করতে অক্ষম হও, তাহলে তোমার একটি পুত্র জন্ম দেওয়ার অধিকার নাই। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ–

"পুত্রার্থে ত্রিয়েৎ ভার্যা পুত্র পিন্ড প্রয়োজনম্।
পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পত্নী গ্রহন করা কর্তব্য। এবং তেমন পুত্র উৎপাদন করতে হবে, যে পিন্ডদানের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম। শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় বলা হয়েছে

"দোষৈরেতৈর কুল ঘ্নানাং বর্ণ সঙ্কর কারকৈঃ।
উৎ সাদ্যন্তে জাতি ধর্মাঃ কুল ধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥"

অর্থাৎ যারা বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্চিত সন্তান সৃষ্টি করে, তাদের কু-কর্ম জনিত দোষের ফলে সর্বপ্রকার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যান উৎসন্নে যায়।

আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে, সন্তান উৎপাদন করাটাই মহৎ কাজ নয়, যদি আমরা অবাঞ্জিত সন্তান লাভ করি, তাহলে কুলের বা বংশের ধ্বংস অনিবার্য।

"একে নাপি কু বৃক্ষেন কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্বং কু পুত্রেন কুলং যথা ॥"

অর্থাৎ একটি মাত্র মন্দ বৃক্ষের কোটবস্থ বহ্নি যেমন সমগ্র বনকে ভষ্মীভূত করতে পারে, ঠিক তেমনই একটি মাত্র মন্দ পুত্র সমগ্র কুলকে ধ্বংস করে দেয়। যার জন্য যথার্থ গৃহস্থ জীবনের নিয়ম কানুন না জেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানে অশান্তির আগুন ঢেলে দেওয়া। তাই বর্নাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনে সহায়তা করা। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন না করে সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধি কোন দিনই সম্ভব নয়। আজ পারমার্থিক দায়িত্বজ্ঞান শুণ্য লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ছাত্র বা যুবশক্তি মানব সমাজকে পারমার্থিক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ছাত্র মানেই পূর্ন ব্রহ্মচর্য পালন ব্রত। এই জীবনই ভবিষ্যৎ জীবনের এবং সমাজ গঠনের ভিত্তি।

আর এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় আচার্যের কাছ থেকে বা যথার্থ সদগুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন–

"তদ্ বিদ্ধি প্রনিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিন ॥"

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তাহলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান দান করবেন। **শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং-** শ্রদ্ধা যার যত বেশী, সে তত পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। বিদ্যার্থীর শ্রদ্ধা না থাকলে বিদ্যা অর্জন সম্ভব নয়। শ্রদ্ধা আসে পূর্ন ব্রহ্মচর্য পালন করার ফলে, ছাত্র বা বিদ্যার্থীর নারীর শরীরকে ভোগ করার বাসনা হৃদয় থেকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। যদি ছাত্রদের নারীর শরীর ভোগের বাসনা হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহলে বুঝতে হবে, জীবনের অধঃপতনের রাস্তা প্রসারীত হচ্ছে, স্ত্রীলোকের জড় দেহের সৌন্দর্য মায়িক, কেননা সেই দেহটি প্রকৃতপক্ষে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ইত্যাদি দিয়ে রচিত। কিন্তু যেহেতু জড় পদার্থের সঙ্গে চিৎস্ফুলিঙ্গের সংযোগ রয়েছে, তাই সুন্দর বলে মনে হয়। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য একটি মাটির পুতুলকে যতই সুন্দরভাবে তৈরী করা হোক না কেন, তার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হয় না, মৃতদেহের কোন সৌন্দর্য নেই। মৃত সুন্দরী রমনীদের দেহ কেউ গ্রহন করে না। কেননা সেই দেহে চিৎস্ফুলিঙ্গটি নেই, যাকে আমরা আত্মা বলে থাকি। আর এই আত্মাই হচ্ছে দেহের সৌন্দর্যের উৎস।

আত্মতত্ব জ্ঞান না থাকলে জড় এবং চিৎময় বস্তুর জ্ঞান থাকে না, কোন কিছু গ্রহন করার আগে বস্তুজ্ঞান না থাকলে মানুষকে গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করতে হয়। তাই বৈদিক জ্ঞান মিথ্যা সৌন্দর্যের প্রতি এবং মিথ্যা সুখের প্রতি আকৃষ্ট হতে নিষেধ করে। আর এই শিক্ষাই ছাত্র বা বিদ্যার্থীর জীবনে স্মরনীয় হওয়া উচিত। ●

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

আর সেই দিব্য জপধ্বনিতরঙ্গ আপনি শুনতে পাবেন। এই অতি সহজ সরল পদ্ধতি আপনাকে প্রত্যেকটি কাজেকর্মে উন্নত করে তুলবে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই বিষয়ে তাঁর আশীর্বাদ রেখে গেছেন-'ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার।' শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপচর্চা করার মাধ্যমেই আপনি সকল বিষয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন। অতি সহজ এই পন্থা।

সুতরাং আমাদের অনুরোধ, আপনি যেই হোন, যে অবস্থায় পদমর্যাদাতেই থাকুন, তাতে কিছু যায় আসে না। **স্থানে স্থিতাঃ।** কেবল একটি জায়গায় সকলে মিলে বাড়িসুদ্ধ বসুন আর হরেকৃষ্ণ জপ করুন। এটি অতি সহজ পদ্ধতি। কেউ বলতে পারেন না যে, এটা ভারি কঠিন কাজ। যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা কঠিন বলে কারও মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা অতি হতভাগ্য। **'এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দৈবমীদৃশম্ ইহজনি নানুরাগঃ।** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, **'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।'** পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম স্বয়ং ভগবানের মতোই সর্বশক্তিমান। **'অভিন্নত্বান্ নামনামিনোঃ।** এটাই শাস্ত্র বাক্য। শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমতত্ত্ব। তিনি অদ্বয়-তত্ত্ব, অদ্বয়-জ্ঞান। সুতরাং তিনি এই যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, **'কলি যুগে নাম রূপে কৃষ্ণ-অবতার।'** এই নাম হল ' হরে কৃষ্ণ'-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দ অবতার। মনে করবেন না এটা একটা সাধারণ কোনও শব্দ। ●

পরম ভাগবত বৈষ্ণব কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী

- শ্রী সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় দু'শ বছর পূর্বে পরমবৈষ্ণব শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। বীরভূম জেলার শিউড়ী থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রাম-যা জয়দেবের আবির্ভাব স্থান বলে বহু জন নির্দেশিত। তাঁর পিতার নাম শ্রীভোজদেব ও মাতা শ্রীবামাদেবী। তখন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। নবদ্বীপে শ্রীল জয়দেব কিছুদিন বাস করছিলেন। তাঁর রচিত 'দশাবতার স্তোত্র' শ্রীলক্ষ্মণ সেন শ্রবণ করে চমৎকৃত হন, এবং তা জয়দেবের রচনা জানতে পেরে রাজা রাজবেশ ত্যাগ করে জয়দেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। মহাপুরুষোচিত আলৌকিক লক্ষণ দর্শন করে তাঁর প্রতি রাজা আরও অধিক আকৃষ্ট হলেন। তাঁকে রাজা নিজ পরিচয় দিলেন এবং নিজ প্রাসাদে রাজ-কবিরূপে অবস্থান করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু জয়দেব ছিলেন অত্যন্ত বিষয় বিরক্ত ব্রহ্মচারী। বিষয়ী রাজগৃহে যেতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা যখন তাঁর মনোভাব জানলেন যে, তিনি শ্রীজগন্নাথপুরীতে চলে যেতে চান, তখন রাজা অনুরোধ করেন যাতে তিনি নবদ্বীপ ছেড়ে কোথাও না যান, এবং নবদ্বীপ মণ্ডলের মধ্যে অতি রমণীয় চাঁপাহাটী গ্রামে তাঁর জন্য রাজা কুটির নির্মাণ করে দিবেন এবং সেখানে জয়দেব থাকবেন। রাজার দৈন্যোক্তি জয়দেব স্বীকার করলেন। চাঁপাহাটীতে থাকলেন। পূর্বে এই স্থানে অসংখ্য চাঁপাফুল ফুটত। কৃষ্ণপ্রেমে ভাবাবিষ্ট জয়দেব এই স্থানে রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু স্বর্ণকান্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। দর্শন দিয়ে মহাপ্রভু তাঁকে জগন্নাথপুরীতে যেতে আদেশ দেন। যদিও নবদ্বীপ ধামের পরিবেশ তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশ পালনের জন্য তিনি পুরুষোত্তম ধামে গমন করলেন।

পুরীধামে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ পুত্র কামনা করে বহুদিন শ্রীজগন্নাথ দেবের আরাধনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এক কন্যা লাভ করেন। কন্যার নাম পদ্মাবতী। বিবাহ যোগ্যা হলে কন্যাকে নিয়ে ব্রাহ্মণ জগন্নাথের পাদপদ্মে উৎসর্গ করবার জন্য আনেন। সেখানে শ্রীজগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নাদেশ করেন-"জয়দেব নামে আমার এক ভক্ত সংসারধর্ম ছেড়ে আমার নাম কীর্তনে মগ্ন আছে, তুমি তাকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর।" জয়দেবের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করতে অনুরোধ করলে জয়দেব বললেন-"না, আমি সংসারী হতে চাই না। আমি আপনার কথা রাখতে সমর্থ নই।" কিন্তু ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ জগন্নাথের আদেশ জানিয়ে তাঁরই বাগদত্তা কন্যাকে তাঁর কাছে রেখে চলে গেলেন। জয়দেব নিতান্তই অপ্রস্তুত হয়ে কন্যাকে বললেন, "তুমি কোথায় যাবে বল, সেখানে তোমাকে রেখে আসি, এখানে তো তোমার থাকা হবে না।" পদ্মাবতী মিনতির সঙ্গে কাতর কণ্ঠে বললেন, বাবা আমাকে জগন্নাথদেবের আদেশে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন। তুমি আমার স্বামী, তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর, আমি তোমার চরণতলে এ জীবন বিসর্জন দেব, হে নাথ, তুমিই আমার একমাত্র গতি।"

মহাকবি জয়দেব তখন আর কি করবেন, পদ্মাবতীকে আর কোথায় পাঠাবেন ? গৃহস্থ জীবন গ্রহণ করতে হল। কিন্তু সেই গৃহস্থ জীবন কিরূপ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে উঠেছিল, তা সাধারণ মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। শ্রীজয়দেব গৃহে একটি শ্রীহরির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা-অর্চনা করতেন। কৃষ্ণপ্রেমে উছলিত হয়ে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থ রচনা করতে লাগলেন। তাঁর পত্নী পদ্মাবতী অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। তাঁদের সেই রাধামাধবের জন্য পরম যত্নে তিনি খাদ্যদ্রব্য রান্না করতেন।

'গীতগোবিন্দ' রচনা করতে গিয়ে জয়দেব এক স্থানে আটকে গেলেন। মান প্রকরণে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডিতা নায়িকা রাধারাণীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবেন, এই কথাটি লিখতে তিনি মোটেই সাহস করছেন না। ভাবছেন-কি করে সম্ভব ভগবানকে ভক্তের চরণে পড়ে ক্ষমা চাইতে হবে, এই চিন্তা করতে করতে সমুদ্রস্নানে বের হলেন।

এমন সময় পদ্মাবতী দেখলেন যে, জয়দেব ফিরে এসেছেন। পদ্মাবতী বললেন, "এইমাত্র তুমি স্নান করতে গেলে, এর মধ্যেই ফিলে এলে কেন ?" তিনি বললেন, "যেতে যেতে একটি কথা মনে পড়ে গেল, পাছে ভুলে যাই, সেইজন্যই এসে লিখে গেলাম।" তিনি চলে গেলে পদ্মাবতী আবার দেখলেন, তাঁর পতি জয়দেব স্নান করে গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। তখন পদ্মাবতী খুবই অবাক হলেন-"এইমাত্র তুমি স্নানে গেলে, ফিরে এসে লিখতে বসলে, আবার এই মাত্র স্নান সেরে এক মুহূর্তেই কিভাবে এলে ?"

জয়দেব বিস্মিত হয়ে চিন্তা করলেন-"এর মধ্যে আমি ফিরে এসে লিখতে বসেছিলাম কখন ?" লেখার ঘরে প্রবেশ করে 'গীতগোবিন্দ' পুথিঁটিকে লক্ষ্য করলেন। তাতে যেখানে তিনি লিখতে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন বলে ফাঁকা রেখেছিলেন সেখানে কে স্বর্ণাক্ষরে লিখে দিয়েছেন-"দেহি পদপল্লবমুদারং"-তোমার পাদপদ্ম দাও। সেই লেখা দেখে জয়দেব অত্যন্ত পুলকিত হলেন, প্রেমাবেশে তাঁর দু'চোখ থেকে বিগলিত অশ্রু হৃদয়ে

বইতে লাগল। তখন তিনি পদ্মাবতীকে সম্বোধন করে বললেন, "তুমিই ধন্য, তোমারই জন্ম সার্থক, তোমার ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হল, আমি হতভাগ্য, সেজন্য তাঁর দর্শন পেলাম না।" অর্থাৎ যিনি এসে লিখতে বসেছিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি জয়দেবের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন।

শোনা যায়-তখনকার উড়িষ্যার রাজা, মন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করতে এসে দেখেন যে, জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে ধুলো লেগেছে, উত্তরীয় বসনটিতে কুলগাছের কাটা জড়ে আছে। এর কারণ কি-জিজ্ঞেস করলে জগন্নাথের সেবকেরা কেউ কিছুই বলতে পারেন না, তাঁরা ভীত হলেন। ধুলোবালি আর এক গোছা কাঁটা কি করে লাগতে পারে-এই চিন্তা করতে করতে সেইদিন কেটে গেল। রাজা রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, জগন্নাথ তাঁকে বলছেন, "রাজা, আমার অঙ্গে ধুলো আর কাঁটা লাগার জন্য কেউ দায়ী নয়, একজন মালিনী "গীতগোবিন্দ' গান করছিল, আমি শুনতে গিয়েছিলাম, সেইজন্য পথে ধুলো আর কাঁটা লেগেছে।" স্বপ্ন ভঙ্গ হলে বিস্মিত হয়ে রাজা সেই গীতগোবিন্দ কীর্তনকারিনী মালিনীকে আনবার জন্য পালকি পাঠালেন। রাজা তাঁকে প্রত্যহ জগন্নাথদেবের সামনে 'গীতগোবিন্দ' গান করবার জন্য আদেশ করলেন। সেই অনুসারে আজও মালিনীর বংশের রমণীরা জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথদেবের সম্মুখে প্রত্যহ 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করে শুনান।

শ্রীজয়দেব একদিন নিজ কুটীরের ছাউনী দিচ্ছিলেন, সেই সময় রোদের প্রচণ্ড তাপ। কিন্তু তাঁর ছাওয়া কাজটি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, কারণ চালের বাঁধন ফিরিয়ে কেউ নিচ থেকে দঁড়ি যুগিয়ে দিচ্ছিল। জয়দেব ভাবলেন, তাঁর পত্নী পদ্মাবতীই বাঁধন ফিরিয়ে দিচ্ছে। চাল ছাওয়া শেষ হলে তিনি নিচে নেমে এসে কাউকেই দেখতে পেলেন না। পদ্মাবতীকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে জানালেন। তাহলে কে দঁড়ির বাঁধন ফিরিয়ে দিচ্ছিল ? বিস্মিত চিত্তে জয়দেব দেখেন ঠাকুর ঘরে রাধামাধবেরই হাতে ঝুলময়লা লেগেছে। বুঝতে পারলেন,–এটি রাধামাধবেরই কাজ।

একদিন কবি জয়দেব রাধামাধবের সেবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে কোথাও গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে কয়েক জন ডাকাত তাঁর টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে তাঁর হাত পা কেটে একটি কুঁয়োর মধ্যে তাঁকে ফেলে দিল। ভক্ত জয়দেব নিদারুন যন্ত্রনা সত্ত্বেও কুয়োর মধ্যে তিনদিন ধরে উচ্চৈস্বরে হরিনাম করতে লাগলেন। তৃতীয় দিনে এক রাজা সেই পথ দিয়ে যেতে কুয়োর ভেতর থেকে হরিনাম শুনতে পেলেন। তিনি ক্ষতবিক্ষত জয়দেবকে নিজপ্রাসাদে এনে বিশেষ যত্নের সঙ্গে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। রাজা-রাণীর যত্নে জয়দেব সুস্থ হলে তাঁরা জয়দেবকে পরমভক্ত জেনে তাঁর সুকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর গীতগোবিন্দ গান শ্রবণ করে তাঁর মধুর চরিত্র দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। পদ্মাবতীকেও তাঁরা রাজভবনে নিয়ে এলেন। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাজা ও রাণী উভয়েই বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জয়দেবের মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও বৈষ্ণব সেবায় জীবন ধন্য করতে লাগলেন।

জয়দেবকে যারা নির্যাতন করেছিল, সেই ডাকাতেরাও বৈষ্ণববেশে রাজভবনে অতিথি হল। কারণ রাজা বৈষ্ণবদের খুবই আদর-যত্ন করেন, অতএব বৈষ্ণববেশে উদরপূর্তি ও অন্যান্য সুখ-সুবিধা পাওয়া যাবে-এই ধান্দা ডাকাতেরা করেছিল। জয়দেব তাদের চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি তাদের যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে অতিথি সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু ডাকাতেরা জয়দেবের মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝতে পেড়ে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে আতিথ্য গ্রহণ না করে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হল। তবুও জয়দেবের চেষ্টায় কিছু অর্থ নিয়ে রাজার অনুচরা তাদের কাছে গেলে তাঁরা নিজেরা কেন এরূপ পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন, তা পথমাঝে অনুচরদের জানায়। কিন্তু তারা সমস্ত কিছু সাজানো বিরাট মিথ্যা কথাই বলেছিল। ফলে সেই মহাপাপীরা আর মাটির উপরে থাকতে পারল না। মাটি হঠাৎ ফেটে যায়, তারা ভূগর্ভে গিয়ে চাপা পড়ে যায়।

আর একদিন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রাজমহিষীর ভাইয়ের মৃত্যুতে ভ্রাতৃবধূর সহমরণ জন্য বিলাপ করছিলেন। সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে জয়দেবপত্নী সতী পদ্মাবতী বলেছিলেন-"স্বামীর মৃত্যুতে পতিব্রতা পত্নীর শরীরে প্রাণ থাকে না।" রাজমহিষী তখন পদ্মাবতীর কথাটি শুনে তার সত্যতা পরীক্ষার জন্য একদিন পদ্মাবতীকে তাঁর স্বামী জয়দেবের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ দিলেন। সেই দুঃসংবাদ কানে আসা মাত্রই সতী পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করলেন। এইরকম পরীক্ষা করতে গিয়ে অত্যন্ত মন্দ পরিনাম হল দেখে রাজমহিষী অত্যন্ত শোককাতর হয়ে কান্না করতে লাগলেন। রাজা তখন নিদারুণ বৈষ্ণব-অপরাধ হয়েছে, দেখে ক্রন্দন করতে করতে জয়দেবকে ডেকে এনে তাঁর পত্নী পদ্মাবতীর প্রাণদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। ভক্তপ্রবর জয়দেব তখন পদ্মাবতীর কর্ণকুহরে কৃষ্ণনামামৃত সিঞ্চন করতে লাগলেন। কৃষ্ণনাম শুনতে পেয়ে পদ্মাবতী চেতনা ফিরে পেয়ে জেগে উঠলেন, যেন ঘুম থেকে উঠলেন। এরকম অদ্ভুত ঘটনা দেখে রাজা ও রাণীর সঙ্গে সমস্ত রাজপরিবার শ্রীজয়দেব-পদ্মাবতীর চরণে বার বার প্রণতি নিবেদন করতে লাগলেন।

শোনা যায়, কেন্দুবিল্ব গ্রামে এসে জয়দেব শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পৌষী কৃষ্ণা-ষষ্ঠীতে তিরোহিত হন। জয়পুরের রাজা শ্রীজয়দেবের তিরোধানের পর তাঁর শ্রীরাধামাধব বিগ্রহকে নিয়ে জয়পুরের ঘাটি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রাধামাধব জয়পুরে সেবিত হচ্ছেন। ●

'দি সায়েন্টিফিক বেসিস অব কৃষ্ণ কন্‌সাসনেস'

কৃষ্ণভাবনামৃতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর স্বামী কর্তৃক লিখিত

অনুবাদক ঃ শ্রী প্রনব সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দ রায়–যিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে পর্যালোচনাকালে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করেন, 'শিক্ষার সর্বোত্তম আদর্শ কি ?' রায় রামানন্দ তৎক্ষনাৎ উত্তর দিলেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানাই হচ্ছে সর্বোত্তম শিক্ষা" শ্রীমদ্‌ভাগবতে উদ্ধৃত আছে, 'বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জানাই হচ্ছে সর্বোচ্চ জ্ঞান।'

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ
বাসুদেবপরং যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ
বাসুদেবপরা জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ !
বাসুদেবপরো ধর্মে। বাসুদেবপরা গতিঃ ॥

উল্লেখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আমাদের জানাচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি সমগ্র ব্রহ্মান্ডের অধিশ্বর, তাঁকে জানাই হচ্ছে জীবের একমাত্র এবং পরম জ্ঞান। তাঁর কাছে প্রপত্তি স্থাপন করা এবং তাঁকে প্রীত করাই হচ্ছে একমাত্র কর্তব্য। আর এটা আমাদের ভক্তি যোগের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। তার ফলে যে কেউ সেই ফল লাভ করবে, যা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত। তিনিই একমাত্র এবং চরম জ্ঞানের আঁধার। ভগবৎ প্রীতি লাভ এবং তাঁকে জানার একমাত্র পথ হচ্ছে কৃচ্ছতা সাধন। ধর্মাচরনের মাধ্যমে ভগবৎ প্রীতি লাভ করা যায়। তাঁকে উপলব্ধি করাই হচ্ছে জীবনের পরম উদ্দেশ্য। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে বিশুদ্ধ প্রীতিময় সেবা দ্বারা তাঁর চরণ কমল লাভ করা সম্ভব। এবং পরমেশ্বর ভগবানের পরম্পরাগত গুরুদেবের মাধ্যমে তা আমাদের অর্জন করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষনা করেছেন, 'হে অর্জুন, একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবা দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করা যায়, এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাকে দেখতে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা আমার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করা সম্ভব।'

আর জড় জগতের সমগ্র জীবকূল আমার প্রতি বা প্রীতিপূর্ণ সেবা বা প্রপত্তিপূর্বক বিষ্ণুপ্রীতি লাভ করতে সমর্থ হবে। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতাতে পরম করুনাময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ওহে কুরুশ্রেষ্ঠ নৃপতি, ত্যাগ ব্যতীত কেউ এই পৃথিবী নামক গ্রহে শান্তিতে বাস করতে পারে না, এই আদর্শের কোন বিকল্প নাই। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই কলিহত জীবের উদ্ধারকল্পে। মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি সংকীর্ত্তন যজ্ঞের এবং পরমেশ্বরের শুদ্ধ নামের মহিমা প্রবর্তন করেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরন প্রসঙ্গ শ্রীমদভাগবতমে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

কৃষ্ণবর্নং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কলির এই মহা দূর্দিনে যারা প্রভূত বুদ্ধিমান, তারা শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করে ভগবৎ ভজনে প্রবৃত্ত হবে।

কলিযুগে জীবের একমাত্র উদ্ধারের পথ হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ। এছাড়া অন্য গতি নাই। অন্য কোন পথ নাই। অন্য পথ নাই। এভাবে হরিকীর্ত্তন করা হচ্ছে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। পদ্ম পুরানেও একথা বলা হয়েছে। ভগবানের বিশুদ্ধ নাম এবং ভগবানের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। ঠিক যেমন, পরমেশ্বরের পূর্ণতা এবং তাঁর নামের বিশুদ্ধতা তাঁর সমানই বিশুদ্ধ এবং চিরসত্য শাস্বত। বিশুদ্ধ নাম কোন জাগতিক শব্দাবলী নয়, আর এই শুদ্ধ নাম কোন জাগতিক ভাবসমৃদ্ধও নয়। কিভাবে ভগবানের এই বিশুর্দ্ধ নাম কীর্ত্তন করতে হবে তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে ব্যাখ্যা করেছেন। যে কেউ এই শুদ্ধ নাম ভক্তিপূর্বক, তৃনখন্ডের চাইতেও দীন, বৃক্ষের চাইতেও সহিষ্ণু, সব রকমের ভ্রান্ত উপাধিমুক্ত এবং সকলের প্রতি বিনম্র ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক আচরণ করবেন। আর এই প্রকার ভক্তিপূর্ণ ধারণা গ্রহণ পূর্বক যে কেউ অনবরত হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করতে পারবেন।

আমরা তাই ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সকল, বিজ্ঞানী দার্শনিক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিকবৃন্দকে, মহামন্ত্র কীর্ত্তন করতে অনুরোধ করছি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। আর মহামন্ত্র কীর্ত্তনে 'চেত দর্পন মার্জন এ' হৃদয়ের উপর আচ্ছাদিত ময়লা পরিষ্কার করে কৃষ্ণভাবনামৃত উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। যা প্রতিটি জীবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমাপ্ত। ●

দাম্পত্যেহভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যাবহারিকে। স্ত্রীত্বে পুংস্ত্বে চ হি রতির্বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।। (ভাঃ ১২/২/৩)

অনুবাদ : কলিযুগে নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র বাহ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে একত্রে বসবাস করবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাফল্য নির্ভর করবে প্রতারণার উপর। যৌন দক্ষতার ভিত্তিতেই পুরুষত্ব ও নারীত্বের বিচার হবে এবং শুধুমাত্র পৈতা ধারণের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলে পরিচিতি লাভ করবেন।

অনাঢ্যতৈবাসাধুত্বে সাধুত্বে দম্ভ এব তু। স্বীকার এব চোদ্বাহে স্নানমেব প্রসাধনম্।। (ভাঃ ১২/২/৫)

অনুবাদ : কলিযুগে কোন মানুষ যদি দরিদ্র হয়, তা হলে তাকে অসাধু বলে গন্য করা হবে এবং দম্ভ ও কপটতাকেই গুন বলে স্বীকার করা হবে। মৌখিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে এবং শুধুমাত্র স্নান করলেই (তিলক, চন্দন আদি ধারণ না করেই) মানুষ নিজেকে জনগণের মধ্যে প্রবেশের যোগ্য বলে মনে করবে।

ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি এবং দেবর্ষিসমূহে পরিবৃত হয়ে মহা বীর্যবান শুকদেব গোস্বামী প্রশান্ত চিত্তে উপবেশন করলে, গ্রহ-নক্ষত্র-
ধারণ করেছিল। শুকদেব গোস্বামীর অঙ্গকান্তি অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মত শ্যামবর্ণ, নবযৌবন জনিত অত্যন্ত সুন্দর এবং বয়
স্কন্ধ, কপোল এবং দেহের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে গঠিত ছিল। তাঁর চোখ দুটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আ
ঠিক একমাপের। তাঁর মুখমন্ডল ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়, এবং তাঁর কণ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত সুগঠিত এবং শঙ্খের মত সুন্দর
রমণীয় ছিল। যদিও তিনি তাঁর স্বাভাবিক মহিমা লুকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানে উপস্থিত মহর্ষিরা ছিলেন দেহের
চিনতে পেরে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সন্মান প্রদর্শন করলেন। পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ তখ
করলেন, এবং হাত জোড় করে সুমধুর বচনে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলেন–

নববর্ষ ১৪

বৈশাখ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩০	৩১					১
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

জৈষ্ঠ্য

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

আষাঢ়

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩১	৩২				১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

শ্রাবণ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		১	২	৩	৪	৫
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০	৩১		

ভাদ্র

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩১					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

আশ্বিন

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১			

রকারাজিতে পরিবেষ্টিত চন্দ্রের মত অতি অপূর্ব শোভা
ছিল মাত্র ষোল বৎসর। তাঁর চরণ, হাত, জঙ্ঘা, বাহু,
র্ঘ বিস্তৃত, তাঁর নাসিকা ছিল উন্নত এবং কান দুটি ছিল
তাঁর দেহের সৌন্দর্য এবং মধুর হাসি রমণীদের কাছে
ক্ষণ বিচারে পটু এবং তাই তাঁকে এক মহাপুরুষরূপে
তাঁর কাছে এসে তাঁকে অবনতমস্তকে প্রণতি নিবেদন

১২

কার্তিক

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯		

অগ্রহায়ণ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

পৌষ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯						

মাঘ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০				

ফাল্গুন

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯			

চৈত্র

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				১	২	৩
৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১

গৌর-পূর্ণিমা উৎসবে শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই নতুন সাজে সজ্জিত

স্বামীবাগ মন্দিরে অভিষেকের জন্য মন্দিরের বাহিরে অবস্থানরত শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই

স্বামীবাগ মন্দিরে শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই -এর অভিষেক
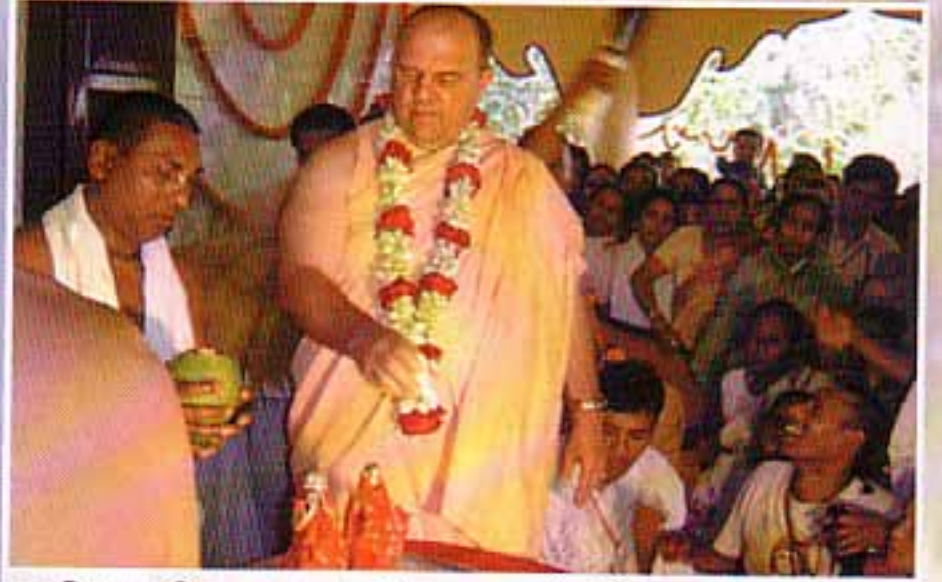
পুন্ডরীকধামে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কর্তৃক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অভিষেক
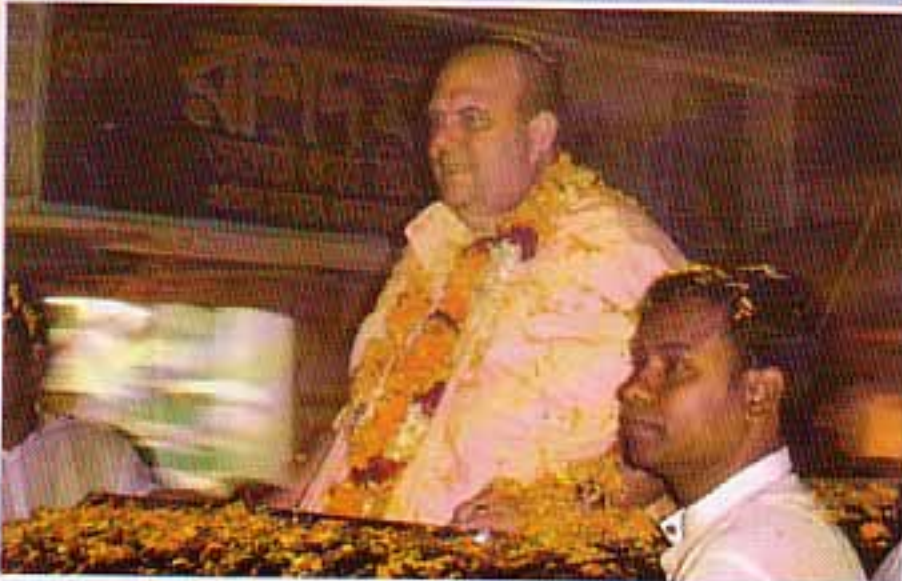
বান্দরবনে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সংকীর্ত্তন পরিক্রমা

ভারত হতে শ্রীলংকা পর্যন্ত দ্বাপরযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সেই প্রাচীন প্রস্তর সেতু

পান্ডব সেনা সদস্যরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদ সাজে সজ্জিত হয়ে লন্ডনের রাস্তায়

লন্ডনের কুইন মেরি'স বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যরা

যত নগরাদি গ্রামে

ভক্তিবেদান্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, মালয়েশিয়া

২০০৪ সালের ১৩ই নভেম্বর সেবারঙ্গ জয় (মালয়েশিয়া প্রজেক্ট), পেনাং-এ শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির এর প্রথম ধাপ ভক্তিবেদান্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল।

সেদিন আরও অনুষ্ঠিত হল, ইস্‌কন মালয়েশিয়া-র ৭ম বার্ষিক হরেকৃষ্ণ সম্মেলন। ১৩ তারিখে সম্মেলন শুরু হয় এবং ১৬ তারিখ শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব তিথিতে শেষ হয়।

পেনাং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কোহ সুহ কুন ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ান হিন্দু সংঘঠনের প্রেসিডেন্ট- তিথিলিঙ্গাম, স্থানীয় সংসদ সদস্য, ইসকনের অন্যতম গুরু ও জিবিসি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী এবং শ্রীমৎ ভক্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বামী। মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং চীনের প্রায় ২,৫০০ ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীলঙ্কা ও প্রাচীন ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধ ঃ

নাসা কর্তৃক গৃহীত মহাশূণ্যের ছবিতে পাক প্রণালীর প্রাচীন সেতু, যেটি ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে রহস্যের সূচনা করেছে। সাম্প্রতিককালে আবিস্কৃত সেতুটি বর্তমানে 'এডামস' সেতু নামে পরিচিত। সেতুটি মাছের ঝাঁকের ন্যায়তবে এটির দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার।

সেতুটির গঠন নমুনা ও বাঁক দেখে অনুমান হয় যে, এটি বুঝি মানুষের তৈরী। এই প্রবাদ প্রতিম সেতু ও তার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষনা থেকে অনুমিত হয় যে, শ্রীলঙ্কার এই জনবসতি প্রায় আদীম মানুষের সময়কালীক অর্থাৎ তা প্রায় এক কোটি সাত লক্ষ বছরের পুরনো। রামায়নের অন্তর্গত এই তথ্যাদি একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রহস্যময়। অনুমান করা যায়, এটি ত্রেতাযুগে সংগঠিত হয়েছিল। মহাকাব্যে উল্লেখ আছে, সেতুটি রামেশ্বর থেকে শ্রীলঙ্কার উপকূল ঘেঁসে তৈরী হয়েছিল। যাঁর প্রধান কর্ণধার ছিলেন,স্বয়ং ভগবান শ্রী রামচন্দ্র।

বৃটিশ পার্লামেন্টে দীপাবলী উৎসব পালন

১০ নভেম্বর ২০০৪ইং বৃটিশ হাউজ অব কমনস এ লন্ডনের ইসকন ভক্তবৃন্দ কর্তৃক সাড়ম্বরে দীপাবলী উৎসব পালিত হয়। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। দীপাবলী উৎসব পালন বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠেছে। গত বছর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই উৎসব উদ্বোধন করেন।

বৃটেনের ভক্তিবেদান্ত ম্যানর মহাধুমধামসহ সুবিশাল অন্নকুটের ব্যবস্থা করে মন্দিরের ভক্তবৃন্দ কর্তৃক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনোরম ফুলের মালা ও আশীর্বাদ প্রদান করেন। উৎসবে আগত ভক্তিবিজ্ঞান স্বামী, মস্কো মন্দিরের জন্য উপস্থিত সকল ভক্ত ও আন্তর্জাতিক সমর্থন কামনা করেন।

ভক্তিবেদান্ত ম্যানরের প্রেসিডেন্ট গৌরী প্রভু সংস্কৃত থেকে একটি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। তবে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে ডেভিড ব্লানকেট, স্ব-রাষ্ট্র বিভাগের সচিব দীপাবলী উৎসবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

জাতীয় সম্প্রচার বিভাগ জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হন। অনুষ্ঠানে গৌরী প্রভু সামান্য কিছু উপহার প্রদান করেন ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পার্লামেন্টের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও অনেক এম,পি,ইসকন ভক্তদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। বৃটিশ স্বরাষ্ট সচিব জ্যাক ষ্ট্র, ডেভিড ব্লানকেট, বিদেশ সচিব, বিরোধী দলের নেতা সায়মন হিউজেস ও লিবার‍্যাল ডেমোক্র্যাট দলের লড ঢোলাকিয়া, পিটার লুট, ভার্জিনিয়া, বটমলি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গৌরী দাস জাতীয় বেতার ও টেলিভিশনের প্রতিনিধির কাছে বিবৃতি দান করেন। বৃটেনের হিন্দু ফোরামের রামানন্দ প্রভু কর্তৃক অনুষ্ঠান করা হয়।

বিশ্ব শান্তি কামনায় বান্দরবনে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের শুভাগমন ঃ

বিশ্বশান্তি কামনায় বান্দরবনে পার্বত্যজেলায় এক মহতী ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর অন্যতম আচার্য্য শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের শুভ আগমন উপলক্ষে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ০৫ইং স্থানীয় বান্দরবন বাজার মাঠে এক মহতী ধর্মসভার আয়োজন করে।

বিশ্বশান্তি কামনায় শ্রীশ্রী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় দূর্গা মন্দির আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষন ছিলেন ইসকন জিবিসির অন্যতম প্রধান গুরু শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভারত থেকে আগত ইসকন জিবিসি ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ। তিনি তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য কিভাবে লাভ করা যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। কিভাবে গুরুকৃপা লাভ করে পরমার্থ সাধন দ্বারা ভক্তিজীবনে ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো যায়-তা নির্দেশ করেন। স্বাগত ভাষন দেন দূর্গা মন্দির কমিটির সাধারন সম্পাদক শ্রী লক্ষীপদ দাস।

পরিশেষে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তাঁর মাধুর্য্য ভঙ্গিমায় ভক্তিরসের প্লাবনে সভাস্থ ভক্ত মন্ডলীর হৃদয়ে এক দিব্য অভিব্যক্তির সঞ্চার করেন। তিনি তার সুললিত সুর মাধুর্য্যে ভক্তিবৃক্ষের ছোট ছোট বৈষ্ণব পদ দ্বারা সকলের হৃদয়ে মহাকালের অমোঘ বাণী পৌছে দেন। ক্ষনকালের মধ্যে সভাস্থ সকল ভক্তহৃদয়ে গভীর অনুরাগের প্রবাহ

(৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

এই যুগের সমস্যাদির পারমার্থিক পর্যালোচনা

–শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার

ধর্মান্তর স্বীকার না করা পর্যন্ত গ্রহণের নিয়ম চালু করা সম্ভব নয়

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সংস্কার সমিতির সভাপতি শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয় তার সম্পাদিত 'মাসিক সমাজ দর্পণ' কে এখন 'সনাতন ধর্মের একমাত্র মাসিক মুখপত্র' বলে প্রচার করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রায় ৭/৮ বছর আগেও পত্রিকাটি 'বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মুখপত্র' হিসেবেই চালু ছিল। হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কেন করা হলো? তাহলে কি সমাজ সংস্কারের কাজটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গেছে? নাকি সংস্কার প্রসঙ্গটি কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হলো? বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলী অভিনিবেশ সহকারে তা ভেবে দেখতে পারেন। সে যা হোক, শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী তার সম্পাদিত সমাজ দর্পন ও দু'পর্বের জ্ঞান মঞ্জুরীতে বারবারই বলে যাচ্ছেন, **"পৃথিবীর সকল মানবই সনাতন ধর্মের অনুসারী; পার্থক্য শুধু উপাসনা পদ্ধতিতে। ইহুদি, খৃষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ইত্যাদি সবই মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত মত। এই মত তৈরি হয়েছে কিছু নিয়ম ও উপাসনা পদ্ধতি পার্থক্যের কারণে। সনাতন ধর্মই একমাত্র ধর্ম। অন্য সকল ধর্মমত, ধর্ম নয়।"** (তথ্যসূত্রঃ জ্ঞানমঞ্জুরী ২য়খন্ড, পৃঃ ১৬২, সমাজ দর্পণ বৈশাখ-১৩৯৯, জ্যৈষ্ঠ-১৪০০, চৈত্র-১৪০২, অগ্রহায়ণ-১৪০৩, আষাঢ়-১৪০৯) অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, **"যত মত তত পথ।"** তার কথার সাথে এ উক্তি মিলিয়ে পড়লে বলা যায় কিছু নিয়ম ও উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্য হলেও পৃথিবীর সব মতই সত্য এবং তা মূলত সনাতন ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী বলতে হয়, মত যাই হোক ধর্ম একটাই; তা হলো সনাতন ধর্ম। পৃথিবীতে ধর্ম যেখানে একটা, সেখানে আবার ধর্মান্তর কিসের? সুতরাং ধর্মান্তর প্রসঙ্গটাই অযৌক্তিক ও অবান্তর। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণভক্ত ও বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলী, বুঝুন এবার সমাজ সংস্কার সভাপতির সমাজ সংস্কারের নমুনা ! ধর্মের নামে এধরনের বিভ্রান্তিকর কিংবা অপব্যাখ্যা কি গ্রহণযোগ্য ?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এটা তো বর্তমানে সাংবিধানিক স্বীকৃত একটি বিষয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এদেশ ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র। পাকিস্তান এখনও **Islamick Republic of Pakistan.** ভ্যাটিক্যান একটি খৃষ্টান রাষ্ট্র। ইসরাইল একটি ইহুদি ধর্মীয় রাষ্ট্র। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি কি এ বাস্তবতা স্বীকার করেন না? সমাজ দর্পণে তো দেখা যায় তিনি স্বীকারই করছেন না। এটা কিন্তু কেবল সংবিধান পরিপন্থী ব্যাপার নয়, জাতিসংঘের সনদের বিরোধীও। এ ধরনের কথা বলে কি সমাজের কোন লাভ হবে? বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সমাজ সংস্কার করা যাবে? নাকি তিনি এভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজের প্রসার ঘটাতে চাচ্ছেন? ধর্মান্তর যেখানে নেই, সেখানে সমাজের প্রসার ঘটাবেন কীভাবে? সনাতন ধর্ম থেকে তো সনাতন ধর্মে আসার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু অতীতে জাতিভেদের তাড়নায় ত্যক্তবিরক্ত হয়ে হাজার হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণ ধর্মান্তরিত হয়ে ভিন্ন ধর্মে চলে গেছে। এটা তো ইতিহাসের বিষয়। সুদর্শন ভট্টাচার্য ধর্মান্তরিত হয়ে আবুল হোসেন ভট্টাচার্য নাম ধারণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত কালাচাঁদ রায় ধর্মান্তরিত হয়ে কালাপাহাড় হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির কথা মানলে বলতে হয়, তারা উভয়ে সনাতন ধর্মেই ছিলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য ১৮টি বই লিখেছিলেন। বইগুলো এখনও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। তার কিছু বই আমার কাছেও আছে। শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, তিনি সব বইই সনাতন ধর্মের উপর লিখেছিলেন। সমাজ দর্পণ আষাঢ়-১৪০৯ সংখ্যায়–মোঃ মাসুদুর রহমান প্রশ্ন রেখেছিলেন, **"হিন্দুরা স্বধর্ম ত্যাগ করে বর্তমান ও অতীতে মুসলমান (ইসলাম) ধর্ম গ্রহণ করেছে কেন? কোন্ ধর্ম সত্য।"** সমাজ দর্পণে দেয়া উল্লিখিত ধরনের উত্তর পাঠ করে মনে হয় তিনি এখনও হাসাহাসি করছেন। এ ধরনের অবান্তব, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর উত্তর পাঠ করে ভিন্ন ধর্মের লোকেরা হাসাহাসি করারই কথা। তবে অন্য ধর্মের লোকেরা যা ইচ্ছা তা মনে করতে পারেন। কিন্তু সমাজের ভেতরের লোকদের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে? তারা কি তার এ ধরনের অসত্য, বিভ্রান্তিকর উত্তর ও একতরফা কথাবার্তা মেনে নিচ্ছেন ? আমার মনে হয় মেনে নিচ্ছেন না; কেউ মেনে নিতে পারেন না। কারণ মনুষ্য প্রবর্তিত কোন ধর্মই সনাতন নয়। তাদের কোন ধর্মগ্রন্থেও তার উল্লেখ নেই।

বাংলাদেশে বর্তমানে ভারতে প্রকাশিত তিনটি পুরোহিত দর্পণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটি পুরোহিত দর্পণেই স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, **"বিপ্র ভিন্ন কারও বেদমন্ত্রে অধিকার নেই। স্ত্রীলোক ও শুদ্রদের বেদমন্ত্রে অধিকার নেই। স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ প্রণব (ওঁ), স্বাহা প্রভৃতি বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করবে না; ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করবে, আর কার্যবিশেষে শূদ্র ও মহিলারা কেবল তা শ্রবণ করবে।"** কিন্তু বিদ্যমান

পুরোহিত দর্পণে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সংজ্ঞা কোথায় ? শূদ্রের সংজ্ঞা কোথায় ? বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারলে শূদ্র-মহিলারা সনাতন ধর্মাবলম্বী হয় কী করে ? বাস্তবে তারাই তো সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাদের প্রতি এ অবমাননাকর উক্তি কেন ? এ অবমাননাকর উক্তি কি বেদের মূলনীতির সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ? এ প্রশ্ন তুললে সমাজ দর্পণের সভাপতি সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। আবার অনেক সময় বলেন, **"আপনারা সমাজ সংস্কার বলুন, বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদ বলুন আর হিন্দু সমাজের দশবিদ সংস্কারের পরিবর্তন, বাস্তবানুগ নীতি প্রণয়ন বা পূজারী পুরোহিত-ব্রাহ্মণের যোগ্যতা নির্নয়ের প্রচেষ্টাই বলুন; সবার মূলে রয়েছে আত্মাকে জানা, ভগবানকে জানা–এক কথায় কৃষ্ণকে জানা।"** (তথ্যসূত্রঃ সম্পাদকীয়, সমাজ দর্পণ ভাদ্র-১৪০৪) আমার কথা কৃষ্ণকে জানলে কেউ কি বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ্য প্রথা মানতে পারেন? তিনি তো মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্রাহ্মণবংশেই জন্মগ্রহণ করেননি। আর গীতায় ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে সংজ্ঞার প্রয়োগ পুরোহিত দর্পণের কোথায় ? কিন্তু আবার ধর্মস্থানে পশুবলির কথা ঠিকই উল্লেখ আছে।

এখন বেদের প্রসঙ্গে আসি। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকের দ্রষ্টা হলেন ঋষি মধুচ্ছন্দা। তাঁর পিতা বিশ্বামিত্র প্রথম জীবনে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাধনা বলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা'ছাড়া ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন মহিলা। তাই বলা যায় পুরোহিত দর্পণের অধিকাংশ বক্তব্য অসত্য ও চরম বিভ্রান্তিকর। আমার মতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান পুরোহিত দর্পণ। সম্মেলন-মহাসম্মেলনে পাশ হওয়া কোন প্রস্তাবের প্রতিফলনই এতে নেই। এর আমূল পরিবর্তন ছাড়া সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। চলমান পুরোহিত দর্পণে কেবল জাতিভেদ নয়; একদল মানুষকে বানানো হয়েছে ঋগ্বেদীয়, আর একদল মানুষকে বানানো হয়েছে সামবেদীয়, আরেক দলকে বানানো হয়েছে যজুর্বেদীয়; অন্য আরেক দলকে বানানো হয়েছে অথর্ববেদীয়। একই ধর্মের মধ্যে এরূপ ভেদ সৃষ্টির কী কারণ থাকতে পারে ? মন্ত্র ও নিয়ম-নীতির পার্থক্যের কী কারণ থাকতে পারে ? মানুষে মানুষে বৈষম্য, নর ও নারীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি কীভাবে সৎকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি হতে পারে–তা আমার মতো অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। এ প্রশ্ন সমাজ দর্পণসহ কয়েকটি পত্রিকায় তোলা হয়েছিল। কিন্তু বোঝানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। অধিকন্তু সমাজ দর্পণকে এখন বানানো হয়েছে, সনাতন ধর্মের একমাত্র মাসিক মুখপত্র। তাহলে সমাজ সংস্কার কি আর হবে না? পুরোহিত দর্পণ যেমনি আছে তেমনিই থাকবে ? **সমাজের ভেতরে যদি বৈষম্য থাকে, ধর্মের মধ্যে কিংবা ধর্মগ্রন্থে যদি বৈষম্য থাকে, তাহলে রাষ্ট্রিক কিংবা বৈশ্বিক বৈষম্য বিলোপের পক্ষে কথা বলার নৈতিক কোন অধিকার বা যোগ্যতা আমাদের থাকে কিনা ? বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলী তা ভেবে দেখতে পারেন।**

অনেক বেদ-বিজ্ঞ পন্ডিতের মতে বেদ প্রথমে অখন্ড ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ ও প্রচারের জন্য প্রথমে ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব– এ চার খন্ডে বেদ বিভাজন করেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ প্রবচন চলে আসছে। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে–এ কিংবদন্তীর সমর্থনসূচক প্রবচন দৃষ্ট হয়। কিন্তু হিন্দু সমাজের বর্তমান পুরোহিত দর্পণে সেই এক বেদের মধ্যেই নানা গোষ্ঠী, নানা প্রকার উপাসনা পদ্ধতি, ব্যয়বহুল আচার-অনুষ্ঠান সন্নিবেশ দেখা যায়। আবার তাতে নারী ও শূদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি এমন অবমাননাকর উক্তি করা হয়েছে, যা পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিবোধের পরিপন্থী। এটা কি গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্মের চরম বিকৃতি ঘটানো ছাড়া সম্ভব হয়েছে?

সব ধর্মেই অন্য সকল ধর্ম ও সমাজ থেকে লোকজন গ্রহণের বিধান চালু আছে। কিন্তু চলমান পুরোহিত দর্পণে সেরূপ কোন বিধি-বিধান সন্নিবেশিত না থাকায় সনাতন ধর্মের অনুদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে। আর সমাজের ভেতরকার (ধর্মগ্রন্থের) বৈষম্য দূর না করা পর্যন্ত এ ধরনের বিধি চালু করাও সম্ভব হবে না। কারণ কেউ কি আর শূদ্র-অস্পৃশ্য-অন্ত্যজরূপে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য এ ধর্মে তথা সমাজে আসবে ? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় কেউ আসবে না। সমাজের ভেতরে তথা গ্রন্থাদিতে আগে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আরও সূক্ষ্মভাবে ভাবলে বলতে হয়, সমতা প্রতিষ্ঠায়ও শুধু হবে না। অন্য ধর্মের অস্তিত্ব ও ধর্মান্তরও স্বীকার করতে হবে। ধর্ম ও জাতিকে কেন গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে ? জাতির উৎপত্তি জন্‌ ধাতু থেকে। আর এর সম্পর্ক জন্মের সাথে, বংশের সাথে কিংবা ভৌগলিক অবস্থানের সাথে। তাই বর্তমান যুগে জাতি বলতে গেলে অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে ধর্মের সম্পর্ক আচার-আচরণ ও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মানার সঙ্গে। তাই ধর্ম সমাজে পরিবর্তনযোগ্য, বদলযোগ্য। বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে। তাহলে 'ধর্মান্তর নেই' বলা হচ্ছে কেন? এ ধরনের অসত্য ও বিভ্রান্তিকর উত্তরে কি সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না ? গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি বলছেন, বিশ্বে ধর্ম একটাই; আর তা সনাতন ধর্ম। তা'হলে কি চীনা, জাপানি, আরবীয়, ইহুদি, তুর্কি, পাকিস্তানী প্রভৃতি সবাই সনাতন ধর্মের অনুসারী ? এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বোধক হলে বলতে হয়, অবস্থান না পাল্টালে আগামী একশ' বছর কেন, পাঁচশ' বছরেও বর্তমান সমাজ সংস্কার সমিতির নেতৃত্বে কোন সমাজ সংস্কার হবে কিনা সন্দেহ আছে। গ্রহণের নিয়ম তো নয়ই। ধর্মান্তর যে সমিতি স্বীকার করে না সে সমিতি বর্ণান্তর কীভাবে স্বীকার করবে ? সংস্কারের কথাবার্তা কি তাহলে নিছক আইওয়াশ ? উল্লেখ্য, ইস্কনের কাছে সমাজ দর্পণের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ও পুরোহিত দর্পণের বংশানুক্রমিক বর্ণবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আর এর দ্বারও সব জাতির মানুষের জন্য উন্মুক্ত। হরে কৃষ্ণ ॥ ●

শ্রীনামামৃত

শ্রীপাদ শুভানন্দ দাস হলেন শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রিয় শিষ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, শিষ্য শ্রীগুরুদেবের সেবা দুইভাবে করতে পারেন। বপুসেবা এবং বাণী সেবা। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিভিন্ন বইতে কৃষ্ণভাবনামৃত এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। শ্রীপাদ সুভানন্দ দাস প্রভুপাদের তিরোভাবের বেশকিছুদিন পর সেগুলো একত্রিত করে শ্রীনামামৃতঃ পবিত্র নামের সুধা (**Sri Namamrta : The nector of the Holy name**) শিরোনামে একটি বই সংকলন এবং সম্পাদনা করেন। বই থেকে গুরুত্বপুর্ন অংশে অনুবাদ করে ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরা হলো।

অনুবাদক ঃ শ্রী মনোরঞ্জন দে।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপই কলিযুগের প্রধান ধর্ম

মহামন্ত্র জপই কলিযুগের মূলধর্ম। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কথা অনেক উপনিষদেও সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কলিসন্তরন উপনিষদ-এ বলা হয়েছে –

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষ নাশনম্
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে

অর্থাৎ, এই নামষোড়শক (বত্রিশ অক্ষরযুক্ত ষোলনাম) হল কলির কলুষনাশক। সমস্ত বেদশাস্ত্রে এর অপেক্ষা পরতর (শ্রেষ্টতর) উপায় দেখা যায় না। অন্যকথায় সমস্ত বেদশাস্ত্র অনুসন্ধান করলেও এই কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র ব্যতীত উৎকৃষ্ট ধর্মাচরণ পদ্ধতি আর পাওয়া যাবে না।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৩/৪০)।

কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম জপ করে যে কেউ জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

একসময় করভজন নামক একজন মহান ঋষি মহারাজ নিমিকে বিভিন্ন যুগে পরমেশ্বর ভগবানের সাধন ভজনের রীতিনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলিযুগে মানুষের কর্তব্য কি-তা প্রকাশ করেন। যা শ্রীমদ্ ভাগবতম-এর ১১/৫/৩৬ শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ-

"যারা অগ্রসরমান এবং যথেষ্ট জ্ঞানী এবং জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, তারা কলিযুগের গুনাবলী ভালভাবেই অবগত আছেন। এই ধরনের লোকেরা কলিযুগে সাধন-ভজনেই নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। কারণ এই যুগে কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমেই যে কেউ পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম এবং জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৪৭)।

কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম জপ করেই যে কেউ মুক্তি লাভ করে ভগবৎ ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেন ঃ "হে রাজন্ কলিযুগ যদিও কলুষে পরিপূর্ণ, তথাপি এই যুগের একটি উত্তম গুন রয়েছে। তা'হল কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেই যে কেউ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় জগতে উন্নীত হতে পারে।

(শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১২/৩/৫; উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৪৪)

সংকীর্ত্তন হল বর্তমানকালের যুগধর্ম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীপাদকে বলেন ঃ "......... কলিযুগে মানুষের প্রধান কাজ হলো অবিরামভাবে কৃষ্ণ নাম জপ করা।"

কলিযুগে–

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে–এই মহামন্ত্র জপের দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চন করতে হয়।

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৩৯)

কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম জপই হলো একমাত্র ধর্মীয় বিধি বিধান।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেন ঃ এই কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম জপ ছাড়া আর কোন ধর্মীয় বিধি-বিধান নেই। কারণ বেদের সমস্ত মন্ত্রাদির সারই হল ভগবানের দিব্যনাম। সমস্ত শাস্ত্রাদির তাৎপর্য এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৭/৭৪)

কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম জপ মুক্তির সর্বোত্তম উপায়।

আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হে প্রিয় স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়, শুনে রাখ যে, কলিযুগে দিব্যনাম সমূহ জপ করাই মুক্তির সর্বোত্তম উপায়।" (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২০/৮)।

পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম জপ করাই কলিযুগের সর্বজনীন ধর্মীয় বিধান।

কলিযুগে ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা প্রচার করাই ধর্মীয় কর্তব্য। কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই পরমেশ্বর ভগবান গৌরবর্ণ রূপ ধারন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হিসাবে অবতরণ করেন। এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম জপ করাই বাস্তব সম্মত পন্থা। পবিত্র নাম জপের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের আরম্ভ হয়। শ্রীল মধ্বাচার্য্য তাঁর "মুন্ডক উপনিষদ" এর ভাষ্যে এই বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি "নারায়ন সংহিতা" থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন–

দ্বাপরে জনৈর বিষ্ণু পঞ্চরাত্রৈ তু কেবলৈ
কলৌ তু নাম-মাত্রেন পুজ্যতে ভগবান হরি।

– অর্থাৎ দ্বাপর যুগে নারদ পঞ্চরাত্র এবং অপরাপর অনুমোদিত শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ভগবান বিষ্ণুর অর্চনা করা

উচিত। আর কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম জপ করাই বিধেয়। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৩/৪০)

কলিযুগে ধর্মের মূল অঙ্গ হিসাবে নাম সংকীর্ত্তনকে শ্রীমদ্ ভাগবতমে্ও অনুমোদন করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতম্-এ বার বার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করাই হল ধর্মের মূল অঙ্গ। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৩/৫০)

কলিযুগে পাপী-তাপীদের উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পবিত্র নামে অবতরণ করেছেন।

কারণ পরমেশ্বর ভগবান ভগবদ্‌গীতায় (৪/৭) নিজেই বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুর্থানম্ ধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥

– অর্থাৎ যে সময় এবং যেখানে ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে, সেই সময় আমি ধরায় অবতীর্ন হই। কলিযুগে মানুষ অত্যন্ত পাপাচারী হয়। ফলে তারা নানা ধরনের জড়জাগতিক অশান্তির সন্মুখীন হয়। এই কলিহত জীবদের উদ্ধারের জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ন হয়েছেন– যা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রেই নিহিত রয়েছে। তাই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে – এই মহামন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। (কুন্তীদেবীর শিক্ষা)

কলিযুগ হলো অধঃপতিত এবং পাপপূর্ণময় যুগ। এথেকে পরিত্রানের জন্য তাই চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি জীবকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের উপদেশ দেন।

কলিযুগে মানুষের আয়ু অল্প। অথচ তারা অলস। আবার নিজেরা পারস্পরিক কলহ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদিতে মত্ত থাকে। তাদের ভাগ্য তাই অতি মন্দ। এইসব পতিত জীবদের উদ্ধারের জন্য তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চৈতন্য মহাপ্রভু হিসাবে ধরা ধামে অবতীর্ন হয়ে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপের পরামর্শ দেন–

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিন্যথা।"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ১৭/২১)

অর্থাৎ, এই কলিযুগে হরিনাম জপ ছাড়া কোন গতি নাই গতি নাই গতি নাই। (বৃহৎ নারদীয় পুরান)।

এই পন্থা চৈতন্য মহাপ্রভুর নিজের আবিষ্কার বা মনগড়া কিছু নয়, এবং পুরানাদি শাস্ত্রসমূহে উপরোক্ত উপদেশই রয়েছে। কলিযুগে পরিত্রানের উপায় অতি সহজ। কেবলমাত্র 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপই যে কোন লোকের জন্য শ্রেয়। (দেবহুতির পুত্র ভগবান কপিলদেবের শিক্ষা)

অনুরূপ ধরনের শ্লোক শ্রীমদ্‌ভাগবতম-এর দ্বাদশ স্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে (১২/৩/৫১)। সেখানে পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কলিযুগের বিভিন্ন কলুষ সম্পর্কে বর্ননা করে শেষে বললেন, **"কলৌ দোষনিধি রাজন অস্তি হে এক মহান গুন** – অর্থাৎ হে রাজন্, কলিযুগের অনেক দোষ থাকলেও একটি ভাল গুন বা সুযোগও রয়েছে।" সেটি কি? **"কীর্ত্তনাদ্ এব কৃষ্ণস্য মুক্ত সংঘ পরম ব্রজেৎ"**– অর্থাৎ কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেই যে কেউ নিজেকে মুক্ত করে ভগবৎধামে ফিরে যেতে পারবে। (আত্মপলব্ধির বিকাশ)।

কলিযুগে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার বিশেষ উপায় হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র।

সাধারনত পরমেশ্বর ভগবানের বিধি বিধানের মাধ্যমে কেবলমাত্র দ্বিজ (ব্রাহ্মন) এবং দেবতারাই জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। বদ্ধজীবেরা কলিযুগে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামেই ব্যস্ত। এই সংগ্রাম থেকে মুক্ত হতে হলে দরকার ভগবৎ প্রদত্ত কোন না কোন বিশেষ মন্ত্র। এক্ষেত্রে প্রথম মন্ত্র হল গায়ত্রী মন্ত্র। এজন্য শুদ্ধ হওয়ার পর যখন কোন লোক দ্বিজ (ব্রাহ্মন) হওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন তাকে গায়ত্রী মন্ত্র দেয়া যায়। এই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে সে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু এই মন্ত্র কেবলমাত্র ব্রাহ্মন এবং দেবতাদের জন্যই উপযুক্ত।

কলিযুগে আমরা সবাই বিপত্তির মধ্যে রয়েছি। এমতাবস্থায় আমাদের জন্যও এমন এক মন্ত্র প্রয়োজন, যা আমাদেরকে কলির দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এজন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়ে 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র প্রদান করেন। তিনি তাঁর শিক্ষাষ্টকে বলেন, **"পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্"** – অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-এর পরম বিজয় হোক। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে –এই মহামন্ত্র প্রভু নিজেই সরাসরি জপ করেছেন।

(শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ৪/৬/১৫)। (চলবে)

সকল এজেন্টদের প্রতি

সকল এজেন্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকা প্রচারে কারো কোনরূপ অনীহা বা অপারগতা থাকিলে, তাহা পূর্ব হতে জানাবেন। পত্রিকা পাঠানোর পরে, গ্রহন না করে পত্রিকার প্যাকেট ফেরত পাঠানো হলে, আমাদের প্রচার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, যেহেতু এজেন্টদের নিকট পত্রিকা পাঠানোর সম্পূর্ণ খরচ আমাদেরকে বহন করতে হয়। তাই সকল এজেন্টদের প্রতি অনুরোধ-পূর্ব অবগত করানো ছাড়া কেহ পত্রিকার প্যাকেট ফেরত পাঠাবেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হল। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম স্কন্ধ ঃ "সৃষ্টি"

শ্লোক ২৭

নাতিপ্রসীদদ্‌ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদং চৌবাচ ধর্মবিৎ॥২৭॥

ন-না; **অতিপ্রসীদৎ**-অত্যন্ত প্রসন্ন; **হৃদয়ঃ**-হৃদয়ে; **সরস্বত্যাঃ**-সরস্বতী নদীর; **তটে**-তটে; **শুচৌ**-পবিত্র হয়ে; **বিতর্কয়ন্**-বিবেচনা করেছিলেন; **বিবিক্ত-স্থঃ**-নির্জন স্থানে স্থিত; **ইদম্ চ**-এটিও; **উবাচ**-বলেছিলেন; **ধর্ম-বিৎ**-ধর্মতত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

হৃদয়ে অপ্রসন্ন হয়ে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি তার অসন্তোষের কারণ তাঁর হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। হৃদয় যতক্ষণ না প্রসন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা যায় না। হৃদয়ের এই প্রসন্নতা অনুসন্ধান করতে হয় জড়া প্রকৃতির উর্ধ্বে।

শ্লোক ২৮-২৯

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্॥২৮॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥ ২৯॥

ধৃত-ব্রতেন-কঠোর ব্রত অবলম্বন করে; **হি**-অবশ্যই; **ময়া**-আমার দ্বারা; **ছন্দাংসি**-বৈদিক স্তব; **গুরবঃ** গুরুদেবগণ; **অগ্নয়ঃ**-যজ্ঞাগ্নি; **মানিতাঃ**- যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **নির্ব্যলীকেন**-নিষ্কপট; **গৃহীতম্ চ**-স্বীকার করে; **অনুশাসনম্**-পরম্পরাগত নিয়ম; **ভারত**-মহাভারত; **ব্যপদেশেন**-সংকলন করে; **হি**-অবশ্যই; **আম্নায়-অর্থঃ**-গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞান; **চ**-এবং; **প্রদর্শিতঃ**-যথাযথভাবে বিশ্লেষিত; **দৃশ্যতে**-দৃষ্টিগোচর হয়; **যত্র**-যেখানে; **ধর্ম-আদিঃ**-ধর্মের পথ; **স্ত্রী-শূদ্র-আদিভিঃ অপি**-স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিরাও; **উত**-বলা হয়েছে।

অনুবাদ

কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজবন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

কঠোর ব্রত অবলম্বন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করা ব্যতীত কেউই বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জ্ঞানলাভেচ্ছু শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করতে হয়। বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত নিগূঢ় রহস্য মহাভারতে সুসংবদ্ধভাবে প্রদান করা হয়েছে, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরাও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই যুগে মূল বেদের থেকেও মহাভারতের উপযোগিতা অধিক।

শ্লোক ৩০

তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥

তথাপি-তবুও; **বত**-ত্রুটি; **মে**-আমার; **দৈহ্যঃ**-দেহস্থ; **হি**-অবশ্যই; **আত্মা**-জীব; **চ**-এবং; **এব**-যদিও; **আত্মনা**-আমি স্বয়ং; **বিভুঃ**-পর্যাপ্ত; **অসম্পন্নঃ**-অপূর্ণ; **ইব-আভাতি**-মনে হয়; **ব্রহ্ম-বর্চস্য**-বৈদান্তিকদের; **সত্তমঃ**-সর্বোচ্চ।

অনুবাদ

যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। বেদের কর্মকাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার ফলে বিষয়াসক্ত মানুষ কলুষমুক্ত হয়, কিন্তু বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যতক্ষন পর্যন্ত না তা লাভ হচ্ছে, জীব সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। শ্রীল ব্যাসদেব যেন সেই সূত্র বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাই অসন্তোষ অনুভব করছেন।

শ্লোক ৩১

কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।

প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥৩১॥

কিম্ বা- অথবা; ভাগবতাঃ ধর্মাঃ- ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ কার্যকলাপ; ন-না; প্রায়েণ-প্রায়; নিরূপিতাঃ-নির্দেশিত; প্রিয়াঃ- প্রিয়; পরমহংসানাম্-পরমহংসদের; তে এব-তাও; হি-অবশ্যই; অচ্যুত-অচ্যুত; প্রিয়াঃ-আকর্ষণীয়।

অনুবাদ

আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব যে তাঁর হৃদয়ে অসন্তোষ অনুভব করেছিলেন তা এখানে তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এটি ভগবানের সেবায় যুক্ত জীবের স্বাভাবিক অনুভূতি। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবারূপী তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং ভগবানেরও প্রীতিসাধন করতে পারে না। ব্যাসদেব তাঁর এই ত্রুটি অনুভব করতে পেরেছিলেন যখন তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি তাঁর কাছে আসেন। পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্ ॥ ৩২॥

তস্য-তাঁর; এবম্-এইভাবে; খিলম্-অধম; আত্মানম্-আত্মা; মন্য-মানস্য-মনে মনে চিন্তা করে; খিদ্যতঃ- অনুশোচনা করে; কৃষ্ণস্য-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের; নারদঃ অভ্যাগাৎ-নারদ মুনি সেখানে এসেছিলেন; আশ্রমম্-আশ্রম; প্রাক্-পূর্বে; উদাহৃতম্-বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে, ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব যে শূণ্যতা অনুভব করছিলেন তা তাঁর জ্ঞানাভাবজনিত ছিল না। ভাগবত ধর্ম হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, যাতে নির্বিশেষবাদীদের কোনও অধিকার নেই। নির্বিশেষবাদীদের পরমহংসদের (সন্ন্যাস আশ্রমের সর্ব্বোচ্চ স্তর) মধ্যে গণনা করা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনায় পূর্ণ। ব্যাসদেব যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, কেন না তাঁর কোন রচনায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। সেই অনুপ্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে ব্যাসদেবের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত সব কিছুই শূণ্য; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তিতে সকাম কর্ম অথবা জ্ঞানের পৃথক প্রয়াস ব্যতীত সব কিছুই পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৩

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্ ॥৩৩॥

তম্ অভিজ্ঞায়-তাঁর (নারদ মুনির) শুভাগমন দর্শন করেন; সহসা-সহসা; প্রত্যুত্থায়-উঠে দাঁড়িয়ে; আগতম্-এসে পৌছলেন; মুনিঃ-ব্যাসদেব; পূজয়ামাস-পূজা; বিধিবৎ-বিধি বা ব্রহ্মার প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় সেই ভাবে; নারদম্-নারদ মুনিকে; সুর-পূজিতম্-দেবতাদের দ্বারা পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

তাৎপর্য

বিধি মানে হচ্ছে ব্রহ্মা, এই জগতের সৃষ্ট জীব। তিনি হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রথম বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক। তিনি বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং সর্বপ্রথমে নারদ মুনিকে তা দান করেছিলেন। তাই নারদ মুনি হচ্ছেন গুরু-পরম্পরার ধারায় দ্বিতীয় আচার্য। তিনি সমস্ত বিধির (নিয়মের) পিতা ব্রহ্মার প্রতিনিধি, তাই তাঁকেও ঠিক ব্রহ্মার মতো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। তেমনই, এই পরম্পরার ধারায় অন্য সমস্ত আচার্যদেরও আদি গুরুর মতোই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইতি-"শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

(চলবে)

সকল গ্রাহকদের প্রতি

সকল গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যে, কারো গ্রাহক মেয়াদ উত্তীর্ন হয়ে থাকলে, অবিলম্বে গ্রাহক ভিক্ষা যথাযথ ঠিকানায় পাঠিয়ে গ্রাহক নবায়ন করে শ্রীশ্রী রাধা মাধবের অপ্রাকৃত সেবায় এগিয়ে আসুন। গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোকালে গ্রাহক নম্বর অবশ্যই পরিস্কারভাবে উল্লেখ করবেন। এবং কারো ঠিকানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাহা জানাবেন।

পত্রিকাটির যথাসময়ে গ্রাহক নবায়ন করুন এবং আপনার পাড়া-প্রতিবেশীকেও পত্রিকাটির গ্রাহক হতে উৎসাহিত করুন।

পঞ্চরাত্র প্রদীপ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তথা ষড়গোস্বামীগণের অর্চনা পদ্ধতির ভিত্তিতে
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত
ইস্‌কন জিবিসি বিগ্রহ অর্চনা গবেষণা গোষ্ঠী সংকলিত

(প্রদক্ষিণ, চরণামৃত গ্রহণ, উপচার নিবেদন, পঞ্চামৃত মন্ত্রাবলী)

(বিগ্রহ প্রদক্ষিণকালে প্রদক্ষিন মন্ত্রাবলী এই প্রার্থনাগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে।)

যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণঃ পদে পদে ॥

পূর্বজন্মে ও এই জন্মে আমি যে সমস্ত পাপ সঞ্চয় করেছি আমার প্রদক্ষিণের প্রতি পদে সে সকলের যেন বিনাশ হয়।

প্রদক্ষিণত্রয়ং দেব প্রযত্নেন ময়া কৃতম্।
তেন পাপানি সর্বাণি বিনাশায় নমোহস্তুতে ॥

হে প্রভু, তোমাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করছি, তুমি আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর। তোমার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

দামোদর পদ্মনাভ শঙ্খচক্রগদাধর।
প্রদক্ষিণং করিষ্যামি কল্পসাধনং হে প্রভো ॥

হে দামোদর, হে পদ্মনাভ, হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি, এইভাবে তোমাকে পরিক্রমা করতে অনুমতি দাও।

চরণামৃত গ্রহণ-মন্ত্রাবলী

(চরণামৃত গ্রহণকালে এই মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে।)

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।

সর্ব ব্যাধিহর, অকালমৃত্যু-বিদুরণকারী শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান করে শিরে ধারণ করছি।

অশেষক্লেশ-নিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
গুরোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবা দানকারী এবং অশেষ ক্লেশ নিঃশেষকারী ভগবান বিষ্ণুর পদ্মপাদোদক পান করে সেই জল মস্তকে স্থাপন করি।

অশেষক্লেশ নিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
গৌরপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবাদানকারী ও অশেষ ক্লেশ বিদুরণকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদোদক পান করে সেই জল আমার শিরে ধারণ করি।

উপচার মন্ত্রাবলী

শাঁখ ঃ

(শঙ্খ স্থাপন কালে বা স্নান ও আরতির সময় শঙ্খ বাজানোর পূর্বে শঙ্খের জপ করা যেতে পারে।)

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোহস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে সভক্তি প্রণাম। পুরা- কালে তুমি সাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক বিধৃত হয়েছ। এইজন্য তুমি সকল দেবতুল্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছ।

তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাংকযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোহস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে সশ্রদ্ধ প্রনাম। তুমি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ সমৃদ্ধ। তোমার গম্ভীর নাদে পর্বত, মেঘ, দেবদেবীগণ ও অসুরকুল সকলেই ভয়ে কম্পিত।

গর্ভা দেবারিনারীনাং বিলয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পঞ্চজন্য নমোহস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে প্রণাম। তোমার বজ্র নির্ঘোষে পাতালে অসুর ঘরণীদের গর্ভ বিদীর্ণ হয়ে সহস্র টুকরো হয়।

ঘন্টা ঃ

(ঘন্টা স্থাপনের সময় পূজার পূর্বে বা আরতির সময় ঘন্টা ব্যবহারের পূর্বে ঘন্টার জপ করা যেতে পারে।)

সর্ববাদ্যময়ি ঘন্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বাং বিনা নৈব সর্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে ॥

হে অভিরাম ঘন্টে, হে দেবতাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ঘন্টে, তুমি সকল সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বরের মূর্তরূপ। তোমা বিনা কারও কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে না।

উপচার প্রদানের পূর্বে, উপযুক্ত উপচার মন্ত্র জপ করা যেতে পারে।

আসন ঃ

সর্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব বীজামীদং ততঃ।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্ ॥

হে সকল জীবের পরমাত্মা, হে মুক্ত ভগবান, আমি তোমাকে এই সকল কিছুর বীজ পবিত্রতম আসন প্রদান করছি।

স্বাগত ঃ

কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতং তু মে।
যদ্ আগতোহসি দেবেষ চিদানন্দময়াব্যয় ॥

হে মহাপ্রভু, হে চিদানন্দ, তুমি এসেছ বলে আমার জীবন সার্থক হয়েছে।

পাদ্য ঃ

যদ্‌ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লবঃ।
তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পতে ॥

হে পরমেশ্বর, আমার বিশুদ্ধির জন্য আমি এই পাদ্য রচনা করেছি। তোমার প্রতি এক বিন্দু ভক্তির জন্য পারমানন্দের বন্যা বয়ে যায়।

অর্ঘ্য ঃ

তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়াবিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্ ॥

ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তোমাকে অর্ঘ্য

নিবেদন করছি। দিব্য আনন্দে পূর্ণ এই অর্ঘ্যের ত্রিতাপ জ্বালা দূরীকরণের ক্ষমতা আছে।

আচমন ঃ

বেদানামপি বেদায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচমনং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥

বেদের মূর্ত স্বরূপ ও দেবতাদের প্রভুর প্রতি আমি শুদ্ধকে বিশুদ্ধ করতে এই আচমন প্রদান করছি।

মধুপর্ক ঃ

সর্বকল্মষহানায় পরিপূর্ণং স্বধাত্মকং।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥

সমস্ত অপবিত্রতা ধ্বংস করতে হে পরমেশ্বর, আমি এই যথাযথ ও পবিত্র মধুপর্ক প্রদান করছি। আমার প্রতি করুণা কর।

পুনরাচমন ঃ

উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রাতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥

যাঁর স্মরণে একজন অপবিত্র ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করে, সেই তোমাকে আমি এই আচমন সমর্পন করছি।

স্নান ঃ

পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্তয়ে।
সংগোপঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহশি তে ॥

সকল অর্ঘ্যের সমষ্টি যে স্নানার্ঘ্য হে পরমানন্দ ও বোধের সাগর-স্বমূর্তিতে নিমগ্ন, তোমাকে আমি এই স্নানার্ঘ্য নিবেদন করছি।

বস্ত্র ঃ

ময়া চিত্রপতাচ্ছান্ন-নিজ গুহ্যোরু-তেজসে।
নিরাভরণবিজ্ঞান বাসংতে কল্পয়াম্যহম্ ॥

হে পরমেশ্বর, যাঁর, দীপ্তিশীল নিম্নাঙ্গ আকর্ষণীয় মোহ বস্ত্রে আবৃত, তাঁকে আমি এই স্পষ্ট জ্ঞান বস্ত্র অর্পণ করছি।

উত্তরীয়-বস্ত্র (উর্ধ্বাঙ্গবাস)

যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎ সম্মোহনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ ॥

যাঁর আশ্রয়ে থেকে মহামায়া জীবকে সম্মোহন করেন, সেই পরম পুরুষকে আমি এই উত্তরীয় বস্ত্র অর্পণ করছি।

উপবীত ঃ

যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞে সুত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥

এই যজ্ঞ-সূত্র আমি তোমাকে অর্পণ করছি। যে সূত্র ও তোমার ত্রি-শক্তি দ্বারা তুমি গোটা ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত করছ সেই সূত্র তুমিই।

আভরণ ঃ

স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় সত্যাসত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চিত ॥

নিত্য ও অনিত্যের শরণ ও স্বভাবতই সুন্দর দেহধারী হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি এই জমকালো অলঙ্কারগুলি তোমাকে প্রদান করছি।

গন্ধ ঃ

পরমানন্দ-সৌরাভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥

কৃপা করে চতুর্দিক আমোদিত এই পরমানন্দময় সুগন্ধ গ্রহণ কর।

তুলসী ও পুষ্প ঃ

তুরীয়গুণসম্পন্নং নানগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥

নানাগুণে মনোহর তুরীয়গুণ সম্পন্ন এই পুষ্প (ও তুলসী পত্র) অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর।

ধূপ ঃ

বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

বনস্পতি রসোৎপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট সকল দেব-দেবীকে সুমিষ্ট গন্ধ দানকারী যে সৌরভ, হে প্রভু কৃপা করে তা গ্রহণ কর।

দীপ ঃ

স্বপ্রকাশো মহাতেজঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

হে পরম প্রভু, কৃপা করে এই মহা তেজোদীপ্ত, বাহ্যাভ্যন্তরে প্রদীপ্ত সর্ব তিমিরাপহারক প্রদীপ গ্রহণ কর।

নৈবেদ্য ঃ

(ওঁ) নিবেদয়ামি ভবতে গৃহাণেদং হবিহরে।
হে শ্রীহরি, কৃপাপূর্বক এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

তাম্বুল ঃ

তাম্বুলং চ সকর্পূরং সুগন্ধদ্রব্যমাশ্রিতম্।
নাগবল্লীদলৈর্যুক্তং গৃহাণবরদো ভব ॥

নাগ-বল্লীর পাতায় গন্ধদ্রব্য জড়ানো কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল গ্রহণ কর। কৃপা করে তোমার আশীর্বাদ প্রদান কর।

পঞ্চামৃত-মন্ত্রাবলী

(বিগ্রহকে স্নানের পূর্বে বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপের পর পঞ্চামৃতের নির্দিষ্ট আধারের ওপর আটবার এই গদ্য মন্ত্র জপ করা যেতে পারে)

দুগ্ধ ঃ

ওঁ পয়ঃ পৃথিভ্যাম্ পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যান্তরিক্ষে।
পয়োধা পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্ ॥

দধি ঃ

ওঁ দধি ক্রাবৃণো অকারিস্‌ং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভিনো মুখাকরৎ প্র.ণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥

ঘি ঃ

ওঁ ঘৃতং ঘৃতপাবানাঃ পিবত সম্ বসা পাবানঃ
পিবতান্তরীক্ষস্য হবির,সি স্বাহা।

দিশঃ প্রদিশা আদীশো বিদিশা উাদ্দশো দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা ॥

মধু ঃ

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবো মাধ্বীর
নঃ সন্ত্ব ওষধীর্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ
পার্থিবং রজঃ মধু দ্যায়ুরস্তু নঃ পিতা মধুমান নো
বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু
নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

চিনির জল ঃ

ওঁ অপাং রসমুদ্‌বয়সং সূর্যে শান্তং সমাহিতম্
অপাং রসস্য যো রসস্তং বো গৃহ্নাম্যুত্তমুপায়াম
গৃহীতোহষীন্দ্রায় যুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় তে
যুষ্টতমম্।

রম্য রচনা

পথিক–গন্তব্য

– শ্রী অভাজন রায়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গন্তব্য ঃ সুপ্রভাত বন্ধু ! এই নাও 'অমৃতের সন্ধানে'। দ্যাখো তোমার আমার কথাগুলো কেমন মজা করে হবহু ছাপিয়েছে।

পথিক ঃ শারদীয় শুভেচ্ছা। আরে-চারিদিকে দূর্গাপূজার আমোদ-ফূর্তি চলছে; আর এর মাঝে সাঝ সকালে তোমার অমন অলক্ষনে হাসি। আমার মোটেই ভাল লাগল না। আর এসব পত্রিকায় প্রকাশিত হলেতো আমার কীর্তি-কুকীর্তি-অকীর্তি সবই বেফাশ হয়ে যাবে। তখন-তখন আমার মুখ দেখা দায়.......

গন্তব্য ঃ চিন্তা কিসের বন্ধু। সাথে আমি আছি না। সব মিটমাট করে দেব। মনে রেখো-আমি তোমার গন্তব্য বন্ধু। জীবনের চরম গন্তব্যে আমি তোমাকে নিয়ে যাব। গতকাল তুমি হাতে তালি দিয়েই আমাকে বাজিমাত করতে চেয়েছিলে। আজ কিন্তু তা করতে দেব না। কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেব।

পথিক ঃ রাখ তোমার তত্ত্ব-টত্ত্ব। এখন চারদিকে মায়ের পূজোর ধুমধারাক্কা চলছে। ঐ যে দ্যাখো পূজামন্ডপে কেমন আধুনিক ডিজাইনে মা-দূর্গা সপরিবারে মর্তধামে এসেছেন।

গন্তব্য ঃ হে! হে! আধুনিক যুগে, আধুনিক ভক্তের পূজাগৃহে আধুনিক মা দুর্গার আগমন ঘটবে এটাইতো স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের তথাকথিত পূজার ঘোর প্রতিপক্ষ আমি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসব পূজাকে অবৈধ......

পথিক ঃ এই যে আবার টেনে টুনে নিয়ে যাচ্ছ কেষ্ট মেষ্ট ঠাকুরের চেলা বোষ্টমদের একচেটিয়া কথা বার্তায়। 'শোন, বোষ্টম্‌দের কেষ্ট ঠাকুরকে নিয়ে কুকুরের ন্যায় আর চেচামেচী করো না-তো। আমিও একটু-আধটু গীতা-টীতা পড়েছি। সেখানে (গীঃ ৯/২৩) বোষ্টমদের কেষ্ট ঠাকুরইতো বলেছে, দেব-দেবীর পূজা করা মানে কেষ্ট ঠাকুরেরই পূজা। তাহলে কেষ্ট-বিষ্টু ঠাকুরের পালিত পরপিন্ডভোজী বোষ্টমদের ধামাধরা চাটুকার হয়ে তুমি কেবলই দেবতা পূজার প্রতিপক্ষে কথা বলছো কেন ? এতো ভারী অন্যায়।

গন্তব্য ঃ দ্যাখ ভায়া, কেষ্ট ঠাকুর কেবল বোষ্টমদেরই ঠাকুর নন্। বোষ্টম-টোষ্টম সকলেরই ঠাকুর তিনি। তিনি অনন্তগোষ্ঠীর ঠাকুর। আর একটা কথা বলি, গীতার তত্ত্বকথা অত টপ করে বুঝতে পারবে না তুমি। তার সময় লাগবে। দেশে খালে-ডোবায় কচুরীপানার ন্যায় অসংখ্য অবাঞ্ছিত সাধু-মহাজন আছে, যাদের গীতা মুখস্থ-কণ্ঠস্থ-উদরস্থ, কিন্তু গীতার তত্ত্ব বোঝে না। আইন পালন করে না। তোমাকে একে একে সকল কিছুর প্রেসক্রিপশন্ দেব।

এই যে দ্যাখো, যে দুর্গাপূজার কথা বললে-এই পূজায় কত অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়'তা তুমি জানো ? পূজার চাঁদার টাকায় মদ খাওয়া, পাঠাবলি দেওয়া। তাছাড়া পতিত পুরোহিতের দায়সারা পূজা। এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন কাপড়-চোপড় কেনা-কাটা করা-এরই নাম এখন দুর্গাপূজা। এটা পূজা নয়-পূজোৎসব। তাই জন্যে বৈষ্ণব ঠাকুরের গলা মিলিয়ে বলতে চাই-

'আমরা দেবতাদিগের উপাসনা করি কেন ? তাঁদের সেবা বা তাদের সুখ বিধান করবার জন্যে কি ? না, তাঁরা আমাদের সেবা করবে, আমাদের খিদ্‌মদ্‌গিবি না নকরি করবে বলে ? মার্কন্ডেয় পুরানে 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনা দেখতে পাই। আমরা সকলে দেবতাদের দিয়ে নিজেদের সুখটা পাইয়ে নিতে চাই, তাঁদের সুখ বিধান করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাতে কি হচ্ছে ? আমরা চিরকাল থাকব না বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা হচ্ছে, বাদবাকী লোকের চামড়া তুলে নিয়ে আমাদের জুতো তৈরী করে আমরা সুখী হব। আমাদের ইন্দ্রিয়ে সুবিধার জন্যে কেবল চেষ্টা হচ্ছে।

পথিক ঃ আবার সেই কথা বলতে হচ্ছে। বোষ্টমদের সংকীর্ণতা তোমাকে সংক্রামিত করেছে। আমার কথার সোজা জবাব না দিয়ে ইনিয়ে বিনেয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন ? কেষ্ট ঠাকুর যে বললো (গীঃ ৯/২৩) দেবতা পূজা করলে তাঁরই (কেষ্ট) পূজা হয় এইটার আগে অ্যান্‌স্যার দাও।

গন্তব্য ঃ শোন তাহলে একটু আগে বললে তুমি গীতা-টীতা পড়েছ। আমি বলি, তোমার পড়া হয় নাই চক্ষু দিয়া। তাছাড়া তোমার ঘিলু এখনও পিওর হয়নি। পেঁচা সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়, তোমার অবস্থাটাও কিন্তু তাই। কৃষ্ণ সূর্যসম- তা সত্বেও তাঁকে এবং তাঁর বক্তব্যকে তুমি বুঝতে পার না। তুমি যে শ্লোকের (গীঃ ৯/২৩) কথা বললে সেই শ্লোকে ভাল করে লক্ষ্য করিও দেখবে তোমার ভাষায় অর্থাৎ যাঁকে তুমি কেষ্ট ঠাকুর বলছো তিনিই বলেছেন, 'যজন্তি অবিধিপূর্বকম্'-ঐ ধরনের দেব-দেবী পূজা অ-বৈধ পূজা। বে-আইনী পূজা। বিধি সম্মত পূজা নয়। অবিধি পূজা। সেই জন্যেই বলা হয়-কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।

'আর একটা কথা ভাই না বলে থাকতে পারলাম না। তুমি যে ঐ উদারতা, সংকীর্ণতা আর গোড়ামীর কথা বললে তার একটু বিচার শোন। তুমি বললে-সব ভাল। এটা কি ঐ 'পন্ডিতাঃ সমদর্শনঃ'র কথা ? তাঁদের বিচার তোমার জানা নাই। তাঁদের ঐ কথা-আত্মদর্শনের কথা। তা-না হলে তারা কি করে হাতী আর পিঁপড়ে সমান দেখেন ? তুমি কি বল, আলো-অন্ধকার, সতী স্ত্রী-বেশ্যা, দুধ-খড়িগোলাজল, মা-স্ত্রী, ভাই-সম্বন্ধী এদের এক মনে করার নাম উদারতা ? না তা নয়; এটা উদারতা ত নয়ই বরং ঘোরতর পাপও যুক্তিহীন। বৈষ্ণবেরা কখনও গোঁড়ামীর কথা বলেন না। গোড়ামী কোনটি। ভগবানকে- ভগবান, ভক্তকে ভক্ত, দুর্গাকে-দুর্গা, কালীকে-কালী, শিবকে-শিব, এসব বলা গোড়ামী নয় বরং এদের সব এক করে খিচুড়ী তৈরী করার নামই সংকীর্নতা। কোন বিবাহিত স্ত্রীলোক যদি বলেন-আমি অতিশয় উদার, যেহেতু আমি সকলকেই স্বামী বলে বলি' তা'হলে সেটি যেমন নীতি বিগর্হিত, তেমনি সব দেবতাকে যার যেটা প্রকৃত স্থান সেইখানে না বসালে ঐ স্ত্রীলোকের মত ভুল হয়ে যাবে।'

'সত্যের সেবক হওয়ার নাম গোঁড়ামী নয়। বরং কোনটাই মানব না অথচ সবটাকেই ভাল বলে বেড়াব এইরূপ তথাকথিত উদারতাটি উদারতা নহে, উহা আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপটতা।' নঃ প্রঃ প্রঃ ॥ (চলবে)

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০টিরও অধিক মন্দির ও প্রকাশনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১০০টিরও অধিক ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির পারমার্থিক দূতরূপে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করে সারা বিশ্বের মানুষের পরম কল্যাণ সাধন করেন। আপনিও এই মহৎ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারীরূপে এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করুন এবং আপনার আত্মীয়-পরিজনকে উপহার দিয়ে শ্রীরাধা-মাধবের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করুন।

ইসকনের প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য গ্রন্থাবলী

ক্রমিক নং	গ্রন্থ তালিকা	ভিক্ষা
১।	ভগবৎ সেট	৩৫০০/=
২।	চৈতন্য চরিতামৃত সেট	১৮০০/=
৩।	শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি	৭০০/=
৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুপার ডিলাক্স	৩৫০/=
৫।	শ্রীমদভগবদ্গীতা ডিলাক্স	৩০০/=
৬।	লীলা পুরুষোত্তম বিজ্ঞান	৩০০/=
৭।	কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান	১১০/=
৮।	আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা	১০০/=
৯।	ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	১০০/=
১০।	বৈষ্ণব কে ?	৮০/=
১১।	বৈষ্ণব শ্লোকাবলী	৮০/=
১২।	চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা	৮০/=
১৩।	প্রভুপাদ	১০০/=
১৪।	কুন্তি দেবীর শিক্ষা	৭০/=
১৫।	ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন	৮০/=
১৬।	কপিল শিক্ষামৃত	৭০/=
১৭।	গীতার রহস্য	৬০/=
১৮।	পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু	৬০/=
১৯।	জীবন আসে জীবন থেকে	৪০/=
২০।	কৃষ্ণভাবনামৃত	৪০/=
২১।	বৈষ্ণব সদাচার	৪০/=
২২।	নামহট্ট দীপিকা	৩০/=
২৩।	দামোদর	৪০/=
২৪।	আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর	২৫/=
২৫।	অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	৩০/=
২৬।	বৈদিক সাম্যবাদ	২০/=
২৭।	ভক্তি রত্নাবলী	২০/=
২৮।	জাগ্রত চেতনা	২০/=
২৯।	কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা	২০/=
৩০।	একাদশী মাহাত্ম্য	২০/=
৩১।	শ্রীগুরুকৃপা লাভের পন্থা	৩০/=
৩২।	ভক্ত প্রশিক্ষন	১৫/=
৩৩।	অমৃতের সন্ধানে	১৫/=
৩৪।	ভগবানের কথা	২০/=
৩৫।	ভক্তি কথা	১৫/=
৩৬।	ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী	১৫/=
৩৭।	কৃষ্ণভাবনার অনুপম উপহার	১৫/=
৩৮।	জগন্নাথদেবের প্রকাশ	২০/=
৩৯।	শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে	১৫/=
৪০।	গীতার সুচনা	১৫/=
৪১।	যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ	১৫/=
৪২।	ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী	১৫/=
৪৩।	বৈষ্ণব শিক্ষা ও সাধনা	১৫/=
৪৪।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা	১৫/=
৪৫।	মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১৫/=
৪৬।	বৈষ্ণব পঞ্জিকা	১০/=
৪৭।	অমৃতের সন্ধানে (পত্রিকা)	১৫/=
৪৮।	রূপসনাতন এর জীবনী	১৫/=
৪৯।	হাইয়ার টেষ্ট	৩০/=
৫০।	উপদেশামৃত	২০/=
৫১।	অর্চন পদ্ধতি	১৫/=
৫২।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্যাবলী	১০/=
৫৩।	গীতা কোর্স	১০০/=
৫৪।	ঈশোপনিষদ	৭০/=
৫৫।	ঈশ্বরের সন্ধানে	২০/=
৫৬।	যোগ সিদ্ধি	৬০/=

ঃ যোগাযোগ করুন ঃ

স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ৭১২০৮৯৫,
৭২১০৮৯৭, মোবা ঃ ০১৭৫০০১২৪০

শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির
৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট
বনগ্রাম (ওয়ারী), ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯, ৭১২৪২৬০,
মোবা ঃ ০১৭২২২২৬৮৫

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

এই যুগের সমস্যাদির পারমার্থিক পর্যালোচনা

–শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার

ধর্মান্তর স্বীকার না করা পর্যন্ত গ্রহণের নিয়ম চালু করা সম্ভব নয়

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সংস্কার সমিতির সভাপতি শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয় তার সম্পাদিত 'মাসিক সমাজ দর্পণ' কে এখন 'সনাতন ধর্মের একমাত্র মাসিক মুখপত্র' বলে প্রচার করে যাচ্ছেন। কিন্তু প্রায় ৭/৮ বছর আগেও পত্রিকাটি 'বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মুখপত্র' হিসেবেই চালু ছিল। হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কেন করা হলো? তাহলে কি সমাজ সংস্কারের কাজটি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গেছে? নাকি সংস্কার প্রসঙ্গটি কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হলো? বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলী অভিনিবেশ সহকারে তা ভেবে দেখতে পারেন। সে যা হোক, শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী তার সম্পাদিত সমাজ দর্পন ও দু'পর্বের জ্ঞান মঞ্জুরীতে বারবারই বলে যাচ্ছেন, **"পৃথিবীর সকল মানবই সনাতন ধর্মের অনুসারী; পার্থক্য শুধু উপাসনা পদ্ধতিতে। ইহুদি, খৃষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ইত্যাদি সবই মহাপুরুষগণের প্রবর্তিত মত। এই মত তৈরি হয়েছে কিছু নিয়ম ও উপাসনা পদ্ধতি পার্থক্যের কারণে। সনাতন ধর্মই একমাত্র ধর্ম। অন্য সকল ধর্মমত, ধর্ম নয়।"** (তথ্যসূত্রঃ জ্ঞানমঞ্জুরী ২য়খন্ড, পৃঃ ১৬২, সমাজ দর্পণ বৈশাখ-১৩৯৯, জ্যৈষ্ঠ-১৪০০, চৈত্র-১৪০২, অগ্রহায়ণ-১৪০৩, আষাঢ়-১৪০৯) অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, **"যত মত তত পথ।"** তার কথার সাথে এ উক্তি মিলিয়ে পড়লে বলা যায় কিছু নিয়ম ও উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্য হলেও পৃথিবীর সব মতই সত্য এবং তা মূলত সনাতন ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী বলতে হয়, মত যাই হোক ধর্ম একটাই; তা হলো সনাতন ধর্ম। পৃথিবীতে ধর্ম যেখানে একটা, সেখানে আবার ধর্মান্তর কিসের? সুতরাং ধর্মান্তর প্রসঙ্গটাই অযৌক্তিক ও অবান্তর। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণভক্ত ও বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলী, বুঝুন এবার সমাজ সংস্কার সভাপতির সমাজ সংস্কারের নমুনা ! ধর্মের নামে এধরনের বিভ্রান্তিকর কিংবা অপব্যাখ্যা কি গ্রহণযোগ্য ?

বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এটা তো বর্তমানে সাংবিধানিক স্বীকৃত একটি বিষয়। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এদেশ ছিল ইসলামিক রাষ্ট্র। পাকিস্তান এখনও **Islamick Republic of Pakistan.** ভ্যাটিক্যান একটি খৃষ্টান রাষ্ট্র। ইসরাইল একটি ইহুদি ধর্মীয় রাষ্ট্র। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি কি এ বাস্তবতা স্বীকার করেন না? সমাজ দর্পণে তো দেখা যায় তিনি স্বীকারই করছেন না। এটা কিন্তু কেবল সংবিধান পরিপন্থী ব্যাপার নয়, জাতিসংঘের সনদের বিরোধীও। এ ধরনের কথা বলে কি সমাজের কোন লাভ হবে? বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সমাজ সংস্কার করা যাবে? নাকি তিনি এভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজের প্রসার ঘটাতে চাচ্ছেন? ধর্মান্তর যেখানে নেই, সেখানে সমাজের প্রসার ঘটাবেন কীভাবে? সনাতন ধর্ম থেকে তো সনাতন ধর্মে আসার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু অতীতে জাতিভেদের তাড়নায় ত্যক্তবিরক্ত হয়ে হাজার হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণ ধর্মান্তরিত হয়ে ভিন্ন ধর্মে চলে গেছে। এটা তো ইতিহাসের বিষয়। সুদর্শন ভট্টাচার্য ধর্মান্তরিত হয়ে আবুল হোসেন ভট্টাচার্য নাম ধারণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত কালাচাঁদ রায় ধর্মান্তরিত হয়ে কালাপাহাড় হয়েছিলেন। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির কথা মানলে বলতে হয়, তারা উভয়ে সনাতন ধর্মেই ছিলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর আবুল হোসেন ভট্টাচার্য ১৮টি বই লিখেছিলেন। বইগুলো এখনও বাংলাদেশে পাওয়া যায়। তার কিছু বই আমার কাছেও আছে। শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, তিনি সব বইই সনাতন ধর্মের উপর লিখেছিলেন। সমাজ দর্পণ আষাঢ়-১৪০৯ সংখ্যায়–মোঃ মাসুদুর রহমান প্রশ্ন রেখেছিলেন, **"হিন্দুরা স্বধর্ম ত্যাগ করে বর্তমান ও অতীতে মুসলমান (ইসলাম) ধর্ম গ্রহণ করেছে কেন? কোন্ ধর্ম সত্য।"** সমাজ দর্পণে দেয়া উল্লিখিত ধরনের উত্তর পাঠ করে মনে হয় তিনি এখনও হাসাহাসি করছেন। এ ধরনের অবাস্তব, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর উত্তর পাঠ করে ভিন্ন ধর্মের লোকেরা হাসাহাসি করারই কথা। তবে অন্য ধর্মের লোকেরা যা ইচ্ছা তা মনে করতে পারেন। কিন্তু সমাজের ভেতরের লোকদের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে? তারা কি তার এ ধরনের অসত্য, বিভ্রান্তিকর উত্তর ও একতরফা কথাবার্তা মেনে নিচ্ছেন ? আমার মনে হয় মেনে নিচ্ছেন না; কেউ মেনে নিতে পারেন না। কারণ মনুষ্য প্রবর্তিত কোন ধর্মই সনাতন নয়। তাদের কোন ধর্মগ্রন্থেও তার উল্লেখ নেই।

বাংলাদেশে বর্তমানে ভারতে প্রকাশিত তিনটি পুরোহিত দর্পণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকটি পুরোহিত দর্পণেই স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, **"বিপ্র ভিন্ন কারও বেদমন্ত্রে অধিকার নেই। স্ত্রীলোক ও শুদ্রদের বেদমন্ত্রে অধিকার নেই। স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ প্রণব (ওঁ), স্বাহা প্রভৃতি বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করবে না; ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করবে, আর কার্যবিশেষে শূদ্র ও মহিলারা কেবল তা শ্রবণ করবে।"** কিন্তু বিদ্যমান

পুরোহিত দর্পণে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সংজ্ঞা কোথায় ? শূদ্রের সংজ্ঞা কোথায় ? বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারলে শূদ্র-মহিলারা সনাতন ধর্মাবলম্বী হয় কী করে ? বাস্তবে তারাই তো সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাদের প্রতি এ অবমাননাকর উক্তি কেন ? এ অবমাননাকর উক্তি কি বেদের মূলনীতির সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ ? এ প্রশ্ন তুললে সমাজ দর্পণের সভাপতি সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। আবার অনেক সময় বলেন, **"আপনারা সমাজ সংস্কার বলুন, বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদ বলুন আর হিন্দু সমাজের দশবিদ সংস্কারের পরিবর্তন, বাস্তবানুগ নীতি প্রণয়ন বা পূজারী পুরোহিত-ব্রাহ্মণের যোগ্যতা নির্নয়ের প্রচেষ্টাই বলুন; সবার মূলে রয়েছে আত্মাকে জানা, ভগবানকে জানা-এক কথায় কৃষ্ণকে জানা।"** (তথ্যসূত্রঃ সম্পাদকীয়, সমাজ দর্পণ ভাদ্র-১৪০৪) আমার কথা কৃষ্ণকে জানলে কেউ কি বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ্য প্রথা মানতে পারেন? তিনি তো মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্রাহ্মণবংশেই জন্মগ্রহণ করেননি। আর গীতায় ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে সংজ্ঞার প্রয়োগ পুরোহিত দর্পণের কোথায় ? কিন্তু আবার ধর্মস্থানে পশুবলির কথা ঠিকই উল্লেখ আছে!

এখন বেদের প্রসঙ্গে আসি। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকের দ্রষ্টা হলেন ঋষি মধুচ্ছন্দা। তাঁর পিতা বিশ্বামিত্র প্রথম জীবনে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাধনা বলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা'ছাড়া ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন মহিলা। তাই বলা যায় পুরোহিত দর্পণের অধিকাংশ বক্তব্য অসত্য ও চরম বিভ্রান্তিকর। আমার মতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদের ভিত্তি হচ্ছে বর্তমান পুরোহিত দর্পণ। সম্মেলন-মহাসম্মেলনে পাশ হওয়া কোন প্রস্তাবের প্রতিফলনই এতে নেই। এর আমূল পরিবর্তন ছাড়া সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। চলমান পুরোহিত দর্পণে কেবল জাতিভেদ নয়; একদল মানুষকে বানানো হয়েছে ঋগ্বেদীয়, আর একদল মানুষকে বানানো হয়েছে সামবেদীয়, আরেক দলকে বানানো হয়েছে যজুর্বেদীয়; অন্য আরেক দলকে বানানো হয়েছে অথর্ববেদীয়। একই ধর্মের মধ্যে এরূপ ভেদ সৃষ্টির কী কারণ থাকতে পারে ? মন্ত্র ও নিয়ম-নীতির পার্থক্যের কী কারণ থাকতে পারে ? মানুষে মানুষে বৈষম্য, নর ও নারীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি কীভাবে সৎকর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি হতে পারে-তা আমার মতো অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। এ প্রশ্ন সমাজ দর্পণসহ কয়েকটি পত্রিকায় তোলা হয়েছিল। কিন্তু বোঝানোর কোন চেষ্টা করা হয়নি। অধিকন্তু সমাজ দর্পণকে এখন বানানো হয়েছে, সনাতন ধর্মের একমাত্র মাসিক মুখপত্র। তাহলে সমাজ সংস্কার কি আর হবে না? পুরোহিত দর্পণ যেমনি আছে তেমনিই থাকবে ? **সমাজের ভেতরে যদি বৈষম্য থাকে, ধর্মের মধ্যে কিংবা ধর্মগ্রন্থে যদি বৈষম্য থাকে, তাহলে রাষ্ট্রিক কিংবা বৈশ্বিক বৈষম্য বিলোপের পক্ষে কথা বলার নৈতিক কোন অধিকার বা যোগ্যতা আমাদের থাকে কিনা ? বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলী তা ভেবে দেখতে পারেন।**

অনেক বেদ-বিজ্ঞ পন্ডিতের মতে বেদ প্রথমে অখন্ড ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস জনগণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ ও প্রচারের জন্য প্রথমে ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব- এ চার খন্ডে বেদ বিভাজন করেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ প্রবচন চলে আসছে। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে-এ কিংবদন্তীর সমর্থনসূচক প্রবচন দৃষ্ট হয়। কিন্তু হিন্দু সমাজের বর্তমান পুরোহিত দর্পণে সেই এক বেদের মধ্যেই নানা গোষ্ঠী, নানা প্রকার উপাসনা পদ্ধতি, ব্যয়বহুল আচার-অনুষ্ঠান সন্নিবেশ দেখা যায়। আবার তাতে নারী ও শূদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি এমন অবমাননাকর উক্তি করা হয়েছে, যা পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিবোধের পরিপন্থী। এটা কি গোষ্ঠীস্বার্থে ধর্মের চরম বিকৃতি ঘটানো ছাড়া সম্ভব হয়েছে?

সব ধর্মেই অন্য সকল ধর্ম ও সমাজ থেকে লোকজন গ্রহণের বিধান চালু আছে। কিন্তু চলমান পুরোহিত দর্পণে সেরূপ কোন বিধি-বিধান সন্নিবেশিত না থাকায় সনাতন ধর্মের অনুদারতাই প্রকাশ পাচ্ছে। আর সমাজের ভেতরকার (ধর্মগ্রন্থের) বৈষম্য দূর না করা পর্যন্ত এ ধরনের বিধি চালু করাও সম্ভব হবে না। কারণ কেউ কি আর শূদ্র-অস্পৃশ্য-অন্ত্যজরূপে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য এ ধর্মে তথা সমাজে আসবে ? নিশ্চিতভাবেই বলা যায় কেউ আসবে না। সমাজের ভেতরে তথা গ্রন্থাদিতে আগে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আরও সূক্ষ্মভাবে ভাবলে বলতে হয়, সমতা প্রতিষ্ঠায়ও শুধু হবে না। অন্য ধর্মের অস্তিত্ব ও ধর্মান্তরও স্বীকার করতে হবে। ধর্ম ও জাতিকে কেন গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে ? জাতির উৎপত্তি জন্‌ ধাতু থেকে। আর এর সম্পর্ক জন্মের সাথে, বংশের সাথে কিংবা ভৌগলিক অবস্থানের সাথে। তাই বর্তমান যুগে জাতি বলতে গেলে অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে ধর্মের সম্পর্ক আচার-আচরণ ও সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মানার সঙ্গে। তাই ধর্ম সমাজে পরিবর্তনযোগ্য, বদলযোগ্য। বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে। তাহলে 'ধর্মান্তর নেই' বলা হচ্ছে কেন? এ ধরনের অসত্য ও বিভ্রান্তিকর উত্তরে কি সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না ? গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি বলছেন, বিশ্বে ধর্ম একটাই; আর তা সনাতন ধর্ম। তা'হলে কি চীনা, জাপানি, আরবীয়, ইহুদি, তুর্কি, পাকিস্তানী প্রভৃতি সবাই সনাতন ধর্মের অনুসারী ? এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বোধক হলে বলতে হয়, অবস্থান না পাল্টালে আগামী একশ' বছর কেন, পাঁচশ' বছরেও বর্তমান সমাজ সংস্কার সমিতির নেতৃত্বে কোন সমাজ সংস্কার হবে কিনা সন্দেহ আছে। গ্রহণের নিয়ম তো নয়ই। ধর্মান্তর যে সমিতি স্বীকার করে না সে সমিতি বর্ণান্তর কীভাবে স্বীকার করবে ? সংস্কারের কথাবর্তা কি তাহলে নিছক আইওয়াশ ? উল্লেখ্য, ইস্কনের কাছে সমাজ দর্পণের বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা ও পুরোহিত দর্পণের বংশানুক্রমিক বর্ণবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আর এর দ্বারও সব জাতির মানুষের জন্য উন্মুক্ত। হরে কৃষ্ণ ॥ ●

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হল। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম স্কন্ধ ঃ "সৃষ্টি"

শ্লোক ২৭

নাতিপ্রসীদদ্‌ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্‌ বিবিক্তস্থ ইদং চৌবাচ ধর্মবিৎ॥২৭॥

ন-না; **অতিপ্রসীদৎ**-অত্যন্ত প্রসন্ন; **হৃদয়ঃ**-হৃদয়ে; **সরস্বত্যাঃ**-সরস্বতী নদীর; **তটে**-তটে; **শুচৌ**-পবিত্র হয়ে; **বিতর্কয়ন্‌**-বিবেচনা করেছিলেন; **বিবিক্ত-স্থঃ**-নির্জন স্থানে স্থিত; **ইদম্‌ চ**-এটিও; **উবাচ**-বলেছিলেন; **ধর্ম-বিৎ**-ধর্মতত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

হৃদয়ে অপ্রসন্ন হয়ে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে বিচার করতে শুরু করলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি তার অসন্তোষের কারণ তাঁর হৃদয়ে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। হৃদয় যতক্ষণ না প্রসন্ন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করা যায় না। হৃদয়ের এই প্রসন্নতা অনুসন্ধান করতে হয় জড়া প্রকৃতির উর্ধ্বে।

শ্লোক ২৮-২৯

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতং চানুশাসনম্‌॥২৮॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থশ্চ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥ ২৯॥

ধৃত-ব্রতেন-কঠোর ব্রত অবলম্বন করে; **হি**-অবশ্যই; **ময়া**-আমার দ্বারা; **ছন্দাংসি**-বৈদিক স্তব; **গুরবঃ** গুরুদেবগণ; **অগ্নয়ঃ**-যজ্ঞাগ্নি; **মানিতাঃ**- যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **নির্ব্যলীকেন**-নিষ্কপট; **গৃহীতম্‌ চ**-স্বীকার করে; **অনুশাসনম্‌**-পরম্পরাগত নিয়ম; **ভারত**-মহাভারত; **ব্যপদেশেন**-সংকলন করে; **হি**-অবশ্যই; **আম্নায়-অর্থঃ**-গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লব্ধ জ্ঞান; **চ**-এবং; **প্রদর্শিতঃ**-যথাযথভাবে বিশ্লেষিত; **দৃশ্যতে**-দৃষ্টিগোচর হয়; **যত্র**-যেখানে; **ধর্ম-আদিঃ**-ধর্মের পথ; **স্ত্রী-শূদ্র-আদিভিঃ অপি**-স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিরাও; **উত**-বলা হয়েছে।

অনুবাদ

কঠোর ব্রত অবলম্বন করে নিষ্কপটভাবে আমি বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করেছি। আমি তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছি এবং গুরুপরম্পরাক্রমে লব্ধ জ্ঞান মহাভারতের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছি, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং অন্য সকলে (দ্বিজবন্ধুরা) ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারে।

তাৎপর্য

কঠোর ব্রত অবলম্বন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসরণ করা ব্যতীত কেউই বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জ্ঞানলাভেচ্ছু শিক্ষার্থীকে অবশ্যই বেদ, গুরুবর্গ এবং যজ্ঞাগ্নির পূজা করতে হয়। বৈদিক জ্ঞানের সমস্ত নিগূঢ় রহস্য মহাভারতে সুসংবদ্ধভাবে প্রদান করা হয়েছে, যাতে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুরাও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই যুগে মূল বেদের থেকেও মহাভারতের উপযোগিতা অধিক।

শ্লোক ৩০

তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যসত্তমঃ ॥ ৩০ ॥

তথাপি-তবুও; **বত**-ত্রুটি; **মে**-আমার; **দৈহ্যঃ**-দেহস্থ; **হি**-অবশ্যই; **আত্মা**-জীব; **চ**-এবং; **এব**-যদিও; **আত্মনা**-আমি স্বয়ং; **বিভুঃ**-পর্যাপ্ত; **অসম্পন্নঃ**-অপূর্ণ; **ইব-আভাতি**-মনে হয়; **ব্রহ্ম-বর্চস্য**-বৈদান্তিকদের; **সত্তমঃ**-সর্বোচ্চ।

অনুবাদ

যদিও আমি বৈদিক দর্শনের অভিপ্রেত সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করেছি, তথাপি আমার হৃদয়ে আমি অপূর্ণতা অনুভব করছি।

তাৎপর্য

নিঃসন্দেহে শ্রীল ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। বেদের কর্মকাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করার ফলে বিষয়াসক্ত মানুষ কলুষমুক্ত হয়, কিন্তু বেদের চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যতক্ষন পর্যন্ত না তা লাভ হচ্ছে, জীব সমস্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। শ্রীল ব্যাসদেব যেন সেই সূত্র বিস্মৃত হয়েছেন এবং তাই অসন্তোষ অনুভব করছেন।

শ্লোক ৩১

কিং বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।

প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥৩১॥

কিম্ বা- অথবা; **ভাগবতাঃ ধর্মাঃ**- ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ কার্যকলাপ; **ন**-না; **প্রায়েণ**-প্রায়; **নিরূপিতাঃ**-নির্দেশিত; **প্রিয়াঃ**- প্রিয়; **পরমহংসানাম্**-পরমহংসদের; **তে এব**-তাও; **হি**-অবশ্যই; **অচ্যুত**-অচ্যুত; **প্রিয়াঃ**-আকর্ষণীয়।

অনুবাদ

আমি যে বিশেষভাবে ভগবদ্ভক্তি বর্ণনা করিনি, যা পরমহংসদের এবং অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাই হয়ত আমার এই অসন্তোষের কারণ।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব যে তাঁর হৃদয়ে অসন্তোষ অনুভব করেছিলেন তা এখানে তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এটি ভগবানের সেবায় যুক্ত জীবের স্বাভাবিক অনুভূতি। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানের সেবারূপী তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং ভগবানেরও প্রীতিসাধন করতে পারে না। ব্যাসদেব তাঁর এই ত্রুটি অনুভব করতে পেরেছিলেন যখন তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনি তাঁর কাছে আসেন। পরবর্তী শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোহভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্॥ ৩২॥

তস্য-তাঁর; **এবম্**-এইভাবে; **খিলম্**-অধম; **আত্মানম্**-আত্মা; **মন্য-মানস্য**-মনে মনে চিন্তা করে; **খিদ্যতঃ**- অনুশোচনা করে; **কৃষ্ণস্য**-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের; **নারদঃ অভ্যাগাৎ**-নারদ মুনি সেখানে এসেছিলেন; **আশ্রমম্**-আশ্রম; **প্রাক্**-পূর্বে; **উদাহৃতম্**-বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

পূর্বে যেমন বর্ণিত হয়েছে, ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন তখন নারদ মুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

ব্যাসদেব যে শূণ্যতা অনুভব করছিলেন তা তাঁর জ্ঞানাভাবজনিত ছিল না। ভাগবত ধর্ম হচ্ছে সর্বতোভাবে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, যাতে নির্বিশেষবাদীদের কোনও অধিকার নেই। নির্বিশেষবাদীদের পরমহংসদের (সন্ন্যাস আশ্রমের সর্ব্বোচ্চ স্তর) মধ্যে গণনা করা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনায় পূর্ণ। ব্যাসদেব যদিও ছিলেন ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তবুও তিনি তাঁর হৃদয়ে অতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন, কেন না তাঁর কোন রচনায় তিনি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। সেই অনুপ্রেরণা শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে ব্যাসদেবের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত সব কিছুই শূণ্য; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তিতে সকাম কর্ম অথবা জ্ঞানের পৃথক প্রয়াস ব্যতীত সব কিছুই পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৩৩

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্॥৩৩॥

তম্ অভিজ্ঞায়-তাঁর (নারদ মুনির) শুভাগমন দর্শন করেন; **সহসা**-সহসা; **প্রত্যুত্থায়**-উঠে দাঁড়িয়ে; **আগতম্**-এসে পৌঁছলেন; **মুনিঃ**-ব্যাসদেব; **পূজয়ামাস**-পূজা; **বিধিবৎ**-বিধি বা ব্রহ্মার প্রতি যেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় সেই ভাবে; **নারদম্**-নারদ মুনিকে; **সুর-পূজিতম্**-দেবতাদের দ্বারা পূজিত।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনির শুভাগমনে শ্রীল ব্যাসদেব শ্রদ্ধা সহকারে উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেইভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

তাৎপর্য

বিধি মানে হচ্ছে ব্রহ্মা, এই জগতের সৃষ্ট জীব। তিনি হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রথম বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপক। তিনি বৈদিক জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং সর্বপ্রথমে নারদ মুনিকে তা দান করেছিলেন। তাই নারদ মুনি হচ্ছেন গুরু-পরম্পরার ধারায় দ্বিতীয় আচার্য। তিনি সমস্ত বিধির (নিয়মের) পিতা ব্রহ্মার প্রতিনিধি, তাই তাঁকেও ঠিক ব্রহ্মার মতো শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। তেমনই, এই পরম্পরার ধারায় অন্য সমস্ত আচার্যদেরও আদি গুরুর মতোই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইতি-"শ্রীনারদ মুনির আবির্ভাব" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

(চলবে)

সকল গ্রাহকদের প্রতি

সকল গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যে, কারো গ্রাহক মেয়াদ উত্তীর্ন হয়ে থাকলে, অবিলম্বে গ্রাহক ভিক্ষা যথাযথ ঠিকানায় পাঠিয়ে গ্রাহক নবায়ন করে শ্রীশ্রী রাধা মাধবের অপ্রাকৃত সেবায় এগিয়ে আসুন। গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোকালে গ্রাহক নম্বর অবশ্যাই পরিস্কারভাবে উল্লেখ করবেন। এবং কারো ঠিকানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে অবশ্যাই তাহা জানাবেন।

পত্রিকাটির যথাসময়ে গ্রাহক নবায়ন করুন এবং আপনার পাড়া-প্রতিবেশীকেও পত্রিকাটির গ্রাহক হতে উৎসাহিত করুন।

পঞ্চরাত্র প্রদীপ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তথা ষড়গোস্বামীগণের অর্চনা পদ্ধতির ভিত্তিতে
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত
ইস্‌কন জিবিসি বিগ্রহ অর্চনা গবেষণা গোষ্ঠী সংকলিত

(প্রদক্ষিণ, চরণামৃত গ্রহণ, উপচার নিবেদন, পঞ্চামৃত মন্ত্রাবলী)

(বিগ্রহ প্রদক্ষিণকালে প্রদক্ষিন মন্ত্রাবলী এই প্রার্থনাগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে।)

যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তরকৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণঃ পদে পদে ॥

পূর্বজন্মে ও এই জন্মে আমি যে সমস্ত পাপ সঞ্চয় করেছি আমার প্রদক্ষিণের প্রতি পদে সে সকলের যেন বিনাশ হয়।

প্রদক্ষিণত্রয়ং দেব প্রযত্নেন ময়া কৃতম্।
তেন পাপানি সর্বাণি বিনাশায় নমোহস্তুতে ॥

হে প্রভু, তোমাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করছি, তুমি আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর। তোমার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

দামোদর পদ্মনাভ শঙ্খচক্রগদাধর।
প্রদক্ষিণং করিষ্যামি কল্পসাধনং হে প্রভো ॥

হে দামোদর, হে পদ্মনাভ, হে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারি, এইভাবে তোমাকে পরিক্রমা করতে অনুমতি দাও।

চরণামৃত গ্রহণ-মন্ত্রাবলী

(চরণামৃত গ্রহণকালে এই মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা যেতে পারে।)

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।

সর্ব ব্যাধিহর, অকালমৃত্যু-বিদুরণকারী শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান করে শিরে ধারণ করছি।

অশেষক্লেশ-নিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
গুরোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

বিশুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবা দানকারী এবং অশেষ ক্লেশ নিঃশেষকারী ভগবান বিষ্ণুর পদ্মপাদোদক পান করে সেই জল মস্তকে স্থাপন করি।

অশেষক্লেশ নিঃশেষকারণং শুদ্ধভক্তিদম্।
গৌরপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ॥

শুদ্ধ ভক্তিপূর্ণ সেবাদানকারী ও অশেষ ক্লেশ বিদুরণকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদোদক পান করে সেই জল আমার শিরে ধারণ করি।

উপচার মন্ত্রাবলী

শাঁখ ঃ

(শঙ্খ স্থাপন কালে বা স্নান ও আরতির সময় শঙ্খ বাজানোর পূর্বে শঙ্খের জপ করা যেতে পারে।)

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোহস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে সভক্তি প্রণাম। পুরা- কালে তুমি সাগর থেকে উৎপন্ন হয়ে ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক বিধৃত হয়েছ। এইজন্য তুমি সকল দেবতুল্য ব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছ।

তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ।
শশাংকযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোহস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে সশ্রদ্ধ প্রনাম। তুমি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ সমৃদ্ধ। তোমার গম্ভীর নাদে পর্বত, মেঘ, দেবদেবীগণ ও অসুরকুল সকলেই ভয়ে কম্পিত।

গর্ভা দেবারিনারীনাং বিলয়ন্তে সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পঞ্চজন্য নমোহস্তুতে ॥

হে পাঞ্চজন্য, তোমাকে প্রণাম। তোমার বজ্র নির্ঘোষে পাতালে অসুর ঘরণীদের গর্ভ বিদীর্ণ হয়ে সহস্র টুকরো হয়।

ঘন্টা ঃ

(ঘন্টা স্থাপনের সময় পূজার পূর্বে বা আরতির সময় ঘন্টা ব্যবহারের পূর্বে ঘন্টার জপ করা যেতে পারে।)

সর্ববাদ্যময়ি ঘন্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বাং বিনা নৈব সর্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে ॥

হে অভিরাম ঘন্টে, হে দেবতাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ঘন্টে, তুমি সকল সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বরের মূর্তরূপ। তোমা বিনা কারও কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে পারে না।

উপচার প্রদানের পূর্বে, উপযুক্ত উপচার মন্ত্র জপ করা যেতে পারে।

আসন ঃ

সর্বান্তর্যামিনে দেব সর্ব বীজামীদং ততঃ।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্ ॥

হে সকল জীবের পরমাত্মা, হে মুক্ত ভগবান, আমি তোমাকে এই সকল কিছুর বীজ পবিত্রতম আসন প্রদান করছি।

স্বাগত ঃ

কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতং তু মে।
যদ্ আগতোহসি দেবেষ চিদানন্দময়াব্যয় ॥

হে মহাপ্রভু, হে চিদানন্দ, তুমি এসেছ বলে আমার জীবন সার্থক হয়েছে।

পাদ্য ঃ

যদ্‌ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লবঃ।
তস্য তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পতে ॥

হে পরমেশ্বর, আমার বিশুদ্ধির জন্য আমি এই পাদ্য রচনা করেছি। তোমার প্রতি এক বিন্দু ভক্তির জন্য পারমানন্দের বন্যা বয়ে যায়।

অর্ঘ্য ঃ

তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়াবিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্ ॥

ত্রিতাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তোমাকে অর্ঘ্য

নিবেদন করছি। দিব্য আনন্দে পূর্ণ এই অর্ঘ্যের ত্রিতাপ জ্বালা দূরীকরণের ক্ষমতা আছে।

আচমন ঃ

বেদানামপি বেদায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচমনং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥

বেদের মূর্ত স্বরূপ ও দেবতাদের প্রভুর প্রতি আমি শুদ্ধকে বিশুদ্ধ করতে এই আচমন প্রদান করছি।

মধুপর্ক ঃ

সর্বকল্মষহানায় পরিপূর্ণং স্বধাত্মকং।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥

সমস্ত অপবিত্রতা ধ্বংস করতে হে পরমেশ্বর, আমি এই যথাযথ ও পবিত্র মধুপর্ক প্রদান করছি। আমার প্রতি করুণা কর।

পুনরাচমন ঃ

উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রাতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥

যাঁর স্মরণে একজন অপবিত্র ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করে, সেই তোমাকে আমি এই আচমন সমর্পন করছি।

স্নান ঃ

পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্তয়ে।
সংগোপঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহশি তে ॥

সকল অর্ঘ্যের সমষ্টি যে স্নানার্ঘ্য হে পরমানন্দ ও বোধের সাগর-স্বমূর্তিতে নিমগ্ন, তোমাকে আমি এই স্নানার্ঘ্য নিবেদন করছি।

বস্ত্র ঃ

ময়া চিত্রপতাচ্ছান্ন-নিজ গুহ্যোরু-তেজসে।
নিরাভরণবিজ্ঞান বাসংতে কল্পয়াম্যহম্ ॥

হে পরমেশ্বর, যাঁর, দীপ্তিশীল নিম্নাঙ্গ আকর্ষণীয় মোহ বস্ত্রে আবৃত, তাঁকে আমি এই স্পষ্ট জ্ঞান বস্ত্র অর্পণ করছি।

উত্তরীয়-বস্ত্র (উর্ধ্বাঙ্গবাস)

যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎ সম্মোহনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়ামুত্তরীয়কম্ ॥

যাঁর আশ্রয়ে থেকে মহামায়া জীবকে সম্মোহন করেন, সেই পরম পুরুষকে আমি এই উত্তরীয় বস্ত্র অর্পণ করছি।

উপবীত ঃ

যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞে সুত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥

এই যজ্ঞ-সূত্র আমি তোমাকে অর্পণ করছি। যে সূত্র ও তোমার ত্রি-শক্তি দ্বারা তুমি গোটা ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত করছ সেই সূত্র তুমিই।

আভরণ ঃ

স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় সত্যাসত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চিত ॥

নিত্য ও অনিত্যের শরণ ও স্বভাবতই সুন্দর দেহধারী হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি এই জমকালো অলঙ্কারগুলি তোমাকে প্রদান করছি।

গন্ধ ঃ

পরমানন্দ-সৌরাভ্য-পরিপূর্ণ-দিগন্তরম্।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥

কৃপা করে চতুর্দিক আমোদিত এই পরমানন্দময় সুগন্ধ গ্রহণ কর।

তুলসী ও পুষ্প ঃ

তুরীয়গুণসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্ ॥

নানাগুণে মনোহর তুরীয়গুণ সম্পন্ন এই পুষ্প (ও তুলসী পত্র) অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর।

ধূপ ঃ

বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

বনস্পতি রসোৎপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট সকল দেব-দেবীকে সুমিষ্ট গন্ধ দানকারী যে সৌরভ, হে প্রভু কৃপা করে তা গ্রহণ কর।

দীপ ঃ

স্বপ্রকাশো মহাতেজঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥

হে পরম প্রভু, কৃপা করে এই মহা তেজোদীপ্ত, বাহ্যাভ্যন্তরে প্রদীপ্ত সর্ব তিমিরাপহারক প্রদীপ গ্রহণ কর।

নৈবেদ্য ঃ

(ওঁ) নিবেদয়ামি ভবতে গৃহাণেদং হবিহরে।
হে শ্রীহরি, কৃপাপূর্বক এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

তাম্বুল ঃ

তাম্বুলং চ সকর্পুরং সুগন্ধদ্রব্যমাশ্রিতম্।
নাগবল্লীদলৈর্যুক্তং গৃহাণবরদো ভব ॥

নাগ-বল্লীর পাতায় গন্ধদ্রব্য জড়ানো কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল গ্রহণ কর। কৃপা করে তোমার আশীর্বাদ প্রদান কর।

পঞ্চামৃত-মন্ত্রাবলী

(বিগ্রহকে স্নানের পূর্বে বিগ্রহের মূল-মন্ত্র জপের পর পঞ্চামৃতের নির্দিষ্ট আধারের ওপর আটবার এই গদ্য মন্ত্র জপ করা যেতে পারে)

দুগ্ধ ঃ

ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাম্ পয় ওষধীষু পয়ো দিব্যান্তরিক্ষে।
পয়োধা পয়স্বতী প্রদিশঃ সন্তু মহ্যম্ ॥

দধি ঃ

ওঁ দধি ক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভিনো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥

ঘি ঃ

ওঁ ঘৃতং ঘৃতপাবানাঃ পিবত সম্ বসা পাবানঃ
পিবতান্তরীক্ষস্য হবির সি স্বাহা।
দিশঃ প্রদিশা আদীশো বিদিশা উদ্দিশো দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা ॥

মধু ঃ

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবো মাধ্বীর
নঃ সন্তু ওষধীর্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ
পার্থিবং রজঃ মধু দ্যয়ুরস্তু নঃ পিতা মধুমান নো
বনস্পতির্মধুমানস্তু সূর্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু
নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

চিনির জল ঃ

ওঁ অপাং রসমুদ্বয়সং সূর্যে শান্তং সমাহিতম্
অপাং রসস্য যো রসন্তং বো গৃহ্নাম্যুত্তমুপায়াম
গৃহীতোহষীন্দ্রায় যুষ্টং গৃহ্নাম্যেষ তে যোনিরিন্দ্রায় তে
যুষ্টতমম্। ●

রম্য রচনা

পথিক-গন্তব্য

– শ্রী অভাজন রায়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গন্তব্য ঃ সুপ্রভাত বন্ধু ! এই নাও 'অমৃতের সন্ধানে'। দ্যাখ্যো তোমার আমার কথাগুলো কেমন মজা করে হবহু ছাপিয়েছে।

পথিক ঃ শারদীয় শুভেচ্ছা। আরে-চারিদিকে দূর্গাপূজার আমোদ-ফূর্তি চলছে; আর এর মাঝে সাঝ সকালে তোমার অমন অলক্ষনে হাসি। আমার মোটেই ভাল লাগল না। আর এসব পত্রিকায় প্রকাশিত হলেতো আমার কীর্তি-কুকীর্তি-অকীর্তি সবই বেফাশ হয়ে যাবে। তখন-তখন আমার মুখ দেখা দায়.......

গন্তব্য ঃ চিন্তা কিসের বন্ধু। সাথে আমি আছি না। সব মিটমাট করে দেব। মনে রেখো-আমি তোমার গন্তব্য বন্ধু। জীবনের চরম গন্তব্যে আমি তোমাকে নিয়ে যাব। গতকাল তুমি হাতে তালি দিয়েই আমাকে বাজিমাত করতে চেয়েছিলে। আজ কিন্তু তা করতে দেব না। কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়ে দেব।

পথিক ঃ রাখ তোমার তত্ত্ব-টত্ত্ব। এখন চারদিকে মায়ের পূজোর ধুমধারাক্কা চলছে। ঐ যে দ্যাখো পূজামন্ডপে কেমন আধুনিক ডিজাইনে মা-দূর্গা সপরিবারে মর্তধামে এসেছেন।

গন্তব্য ঃ হে! হে! আধুনিক যুগে, আধুনিক ভক্তের পূজাগৃহে আধুনিক মা দুর্গার আগমন ঘটবে এটাইতো স্বাভাবিক। তবে এই ধরনের তথাকথিত পূজার ঘোর প্রতিপক্ষ আমি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসব পূজাকে অবৈধ......

পথিক ঃ এই যে আবার টেনে টুনে নিয়ে যাচ্ছ কেষ্ট মেষ্ট ঠাকুরের চেলা বোষ্টমদের একচেটিয়া কথা বার্তায়। 'শোন, বোষ্টম্‌দের কেষ্ট ঠাকুরকে নিয়ে কুকুরের ন্যায় আর চেচামেচী করো না-তো। আমিও একটু-আধটু গীতা-টীতা পড়েছি। সেখানে (গীঃ ৯/২৩) বোষ্টমদের কেষ্ট ঠাকুরইতো বলেছে, দেব-দেবীর পূজা করা মানে কেষ্ট ঠাকুরেরই পূজা। তাহলে কেষ্ট-বিষ্টু ঠাকুরের পালিত পরপিন্ডভোজী বোষ্টমদের ধামাধরা চাটুকার হয়ে তুমি কেবলই দেবতা পূজার প্রতিপক্ষে কথা বলছো কেন ? এতো ভারী অন্যায়।

গন্তব্য ঃ দ্যাখ ভায়া, কেষ্ট ঠাকুর কেবল বোষ্টমদেরই ঠাকুর নন্। বোষ্টম-টোষ্টম সকলেরই ঠাকুর তিনি। তিনি অনন্তগোষ্ঠীর ঠাকুর। আর একটা কথা বলি, গীতার তত্ত্বকথা অত টপ করে বুঝতে পারবে না তুমি। তার সময় লাগবে। দেশে খালে-ডোবায় কচুরীপানার ন্যায় অসংখ্য অবাঞ্ছিত সাধু-মহাজন আছে, যাদের গীতা মুখস্থ-কণ্ঠস্থ-উদরস্থ, কিন্তু গীতার তত্ত্ব বোঝে না। আইন পালন করে না। তোমাকে একে একে সকল কিছুর প্রেসক্রিপশন্ দেব।

এই যে দ্যাখো, যে দুর্গাপূজার কথা বললে-এই পূজায় কত অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়'তা তুমি জানো ? পূজার চাঁদার টাকায় মদ খাওয়া, পাঠাবলি দেওয়া। তাছাড়া পতিত পুরোহিতের দায়সারা পূজা। এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন কাপড়-চোপড় কেনা-কাটা করা-এরই নাম এখন দুর্গাপূজা। এটা পূজা নয়-পূজোৎসব। তাই জন্যে বৈষ্ণব ঠাকুরের গলা মিলিয়ে বলতে চাই-

'আমরা দেবতাদিগের উপাসনা করি কেন ? তাঁদের সেবা বা তাদের সুখ বিধান করবার জন্যে কি ? না, তাঁরা আমাদের সেবা করবে, আমাদের খিদ্‌মদ্‌গিরি না নকরি করবে বলে ? মার্কন্ডেয় পুরানে 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনা দেখতে পাই। আমরা সকলে দেবতাদের দিয়ে নিজেদের সুখটা পাইয়ে নিতে চাই, তাঁদের সুখ বিধান করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাতে কি হচ্ছে ? আমরা চিরকাল থাকব না বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা হচ্ছে, বাদবাকী লোকের চামড়া তুলে নিয়ে আমাদের জুতো তৈরী করে আমরা সুখী হব। আমাদের ইন্দ্রিয়ে সুবিধার জন্যে কেবল চেষ্টা হচ্ছে।

পথিক ঃ আবার সেই কথা বলতে হচ্ছে। বোষ্টমদের সংকীর্ণতা তোমাকে সংক্রামিত করেছে। আমার কথার সোজা জবাব না দিয়ে ইনিয়ে বিনেয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন ? কেষ্ট ঠাকুর যে বললো (গীঃ ৯/২৩) দেবতা পূজা করলে তাঁরই (কেষ্ট) পূজা হয় এইটার আগে অ্যান্‌স্যার দাও।

গন্তব্য ঃ শোন তাহলে একটু আগে বললে তুমি গীতা-টীতা পড়েছ। আমি বলি, তোমার পড়া হয় নাই চক্ষু দিয়া। তাছাড়া তোমার ঘিলু এখনও পিওর হয়নি। পেঁচা সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়, তোমার অবস্থাটাও কিন্তু তাই। কৃষ্ণ সূর্যসম- তা সত্ত্বেও তাঁকে এবং তাঁর বক্তব্যকে তুমি বুঝতে পার না। তুমি যে শ্লোকের (গীঃ ৯/২৩) কথা বললে সেই শ্লোকে ভাল করে লক্ষ্য করিও দেখবে তোমার ভাষায় অর্থাৎ যাঁকে তুমি কেষ্ট ঠাকুর বলছো তিনিই বলেছেন, 'যজন্তি অবিধিপূর্বকম্'-ঐ ধরনের দেব-দেবী পূজা অ-বৈধ পূজা। বে-আইনী পূজা। বিধি সম্মত পূজা নয়। অবিধি পূজা। সেই জন্যেই বলা হয়-কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।

'আর একটা কথা ভাই না বলে থাকতে পারলাম না। তুমি যে ঐ উদারতা, সংকীর্ণতা আর গোড়ামীর কথা বললে তার একটু বিচার শোন। তুমি বললে-সব ভাল। এটা কি ঐ 'পন্ডিতাঃ সমদর্শনঃ'র কথা ? তাঁদের বিচার তোমার জানা নাই। তাঁদের ঐ কথা-আত্মদর্শনের কথা। তা-না হলে তারা কি করে হাতী আর পিপড়ে সমান দেখেন ? তুমি কি বল, আলো-অন্ধকার, সতী স্ত্রী-বেশ্যা, দুধ-খড়িগোলাজল, মা-স্ত্রী, ভাই-সম্বন্ধী এদের এক মনে করার নাম উদারতা ? না তা নয়; এটা উদারতা ত নয়ই বরং ঘোরতর পাপও যুক্তিহীন। বৈষ্ণবেরা কখনও গোঁড়ামীর কথা বলেন না। গোড়ামী কোনটি। ভগবানকে- ভগবান, ভক্তকে ভক্ত, দুর্গাকে-দুর্গা, কালীকে-কালী, শিবকে-শিব, এসব বলা গোড়ামী নয় বরং এদের সব এক করে খিচুড়ী তৈরী করার নামই সংকীর্নতা। কোন বিবাহিত স্ত্রীলোক যদি বলেন-আমি অতিশয় উদার, যেহেতু আমি সকলকেই স্বামী বলে বলি' তা'হলে সেটি যেমন নীতি বিগর্হিত, তেমনি সব দেবতাকে যার যেটা প্রকৃত স্থান সেইখানে না বসালে ঐ স্ত্রীলোকের মত ভুল হয়ে যাবে।'

'সত্যের সেবক হওয়ার নাম গোঁড়ামী নয়। বরং কোনটাই মানব না অথচ সবটাকেই ভাল বলে বেড়াব এইরূপ তথাকথিত উদারতাটি উদারতা নহে, উহা আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপটতা।' নঃ প্রঃ প্রঃ ॥ (চলবে)

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০টিরও অধিক মন্দির ও প্রকাশনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১০০টিরও অধিক ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির পারমার্থিক দূতরূপে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করে সারা বিশ্বের মানুষের পরম কল্যাণ সাধন করেন। আপনিও এই মহৎ কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারীরূপে এই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করুন এবং আপনার আত্মীয়-পরিজনকে উপহার দিয়ে শ্রীরাধা-মাধবের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করুন।

ইসকনের প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য গ্রন্থাবলী

ক্রমিক নং	গ্রন্থ তালিকা	ভিক্ষা	ক্রমিক নং	গ্রন্থ তালিকা	ভিক্ষা
১।	ভগবৎ সেট	৩৫০০/=	২৯।	কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পন্থা	২০/=
২।	চৈতন্য চরিতামৃত সেট	১৮০০/=	৩০।	একাদশী মাহাত্ম্য	২০/=
৩।	শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি	৭০০/=	৩১।	শ্রীগুরুকৃপা লাভের পন্থা	৩০/=
৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সুপার ডিলাক্স	৩৫০/=	৩২।	ভক্ত প্রশিক্ষন	১৫/=
৫।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ডিলাক্স	৩০০/=	৩৩।	অমৃতের সন্ধানে	১৫/=
৬।	লীলা পুরুষোত্তম বিজ্ঞান	৩০০/=	৩৪।	ভগবানের কথা	২০/=
৭।	কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান	১১০/=	৩৫।	ভক্তি কথা	১৫/=
৮।	আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা	১০০/=	৩৬।	ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী	১৫/=
৯।	ভক্তিরসামৃত সিন্ধু	১০০/=	৩৭।	কৃষ্ণভাবনার অনুপম উপহার	১৫/=
১০।	বৈষ্ণব কে ?	৮০/=	৩৮।	জগন্নাথদেবের প্রকাশ	২০/=
১১।	বৈষ্ণব শ্লোকাবলী	৮০/=	৩৯।	শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে	১৫/=
১২।	চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা	৮০/=	৪০।	গীতার সুচনা	১৫/=
১৩।	প্রভুপাদ	১০০/=	৪১।	যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ	১৫/=
১৪।	কুন্তি দেবীর শিক্ষা	৭০/=	৪২।	ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী	১৫/=
১৫।	ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন	৮০/=	৪৩।	বৈষ্ণব শিক্ষা ও সাধনা	১৫/=
১৬।	কপিল শিক্ষামৃত	৭০/=	৪৪।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা	১৫/=
১৭।	গীতার রহস্য	৬০/=	৪৫।	মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	১৫/=
১৮।	পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু	৬০/=	৪৬।	বৈষ্ণব পঞ্জিকা	১০/=
১৯।	জীবন আসে জীবন থেকে	৪০/=	৪৭।	অমৃতের সন্ধানে (পত্রিকা)	১৫/=
২০।	কৃষ্ণভাবনামৃত	৪০/=	৪৮।	রূপসনাতন এর জীবনী	১৫/=
২১।	বৈষ্ণব সদাচার	৪০/=	৪৯।	হাইয়ার টেষ্ট	৩০/=
২২।	নামহট্ট দীপিকা	৩০/=	৫০।	উপদেশামৃত	২০/=
২৩।	দামোদর	৪০/=	৫১।	অর্চন পদ্ধতি	১৫/=
২৪।	আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর	২৫/=	৫২।	গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্যাবলী	১০/=
২৫।	অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	৩০/=	৫৩।	গীতা কোর্স	১০০/=
২৬।	বৈদিক সাম্যবাদ	২০/=	৫৪।	ঈশোপনিষদ	৭০/=
২৭।	ভক্তি রত্নাবলী	২০/=	৫৫।	ঈশ্বরের সন্ধানে	২০/=
২৮।	জাগ্রত চেতনা	২০/=	৫৬।	যোগ সিদ্ধি	৬০/=

ঃ যোগাযোগ করুন ঃ

স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ৭১২০৮৯৫,
৭২১০৮৯৭, মোবা ঃ ০১৭৫০০১২৪০

শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির
৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট
বনগ্রাম (ওয়ারী), ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯, ৭১২৪২৬০,
মোবা ঃ ০১৭২২২২৬৮৫

অদ্বৈতবাদ (মায়াবাদ) বনাম দ্বৈতবাদ (ভক্তিবাদ)

– শ্রী মনোরঞ্জন দে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ঈশ উপনিষদের ১২ নং মন্ত্রকে উদ্ধৃতি দেনঃ-

"অন্ধ তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভূতিমু পাশতে।
ততো ভুয় ইবতে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

অর্থাৎ যারা অধিদেবতাদের অর্চনায় নিয়োজিত হয় তাঁরা দৃষ্টিহীন অন্ধকারে প্রবেশ করে। আবার যারা নির্বিশেষ পরম সত্যের পূজা করে, তারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ-

"ন মে বিদুঃ সুরগনাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥

(গীতা – ১০/২)

অর্থাৎ, দেবতা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না। কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ। আবার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ-

" কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতা ঃ।
তং তং নিয়মঃ মাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাস্বয়াঃ ॥

(গীতা ৭/২০)

অর্থাৎ যাদের মন জড়-কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত তারা অন্য দেবদেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।

দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব আচার্য্যগণ যুক্তি দেন আত্মা এবং পরমাত্মা যদি অভেদ হয়, তবে আত্মা মায়ার মধ্যে কখনো নিপতিত হতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায়ঃ "যদি আমিই ব্রহ্ম হই– অর্থাৎ সর্বোত্তম তবে আমি অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত কিভাবে হতে পারি?" বৈষ্ণববাদীরা যুক্তি দেন যে, বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী পরম সত্য কখনো উপরোক্তভাবে তমসাচ্ছন্ন হতে পারেন না। অথচ অদ্বৈতবাদীদের দর্শন অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা। এজন্য বৈষ্ণব আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদীদেরকে মায়াবাদী বলে অভিহিত করেন। কারণ অদ্বৈতবাদীরা বলেন ভগবানের শক্তি মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। অথচ পরমেশ্বর ভগবান কোন অবস্থাতেই মায়ার অধীন নন–হতে পারে না। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তির আধার।

জড়–জগৎ সৃষ্টির উৎস ঃ অদ্বৈতবাদীরা বলেন, পরম সত্য বা পরব্রহ্ম জড় ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির উৎস নন। শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর পরি নামবাদ–এ পরব্রহ্ম তথা পরমেশ্বর ভগবান থেকেই সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়েছে বলে যুক্তি দেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য এই পরিনামবাদকে নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, যদি পরব্রহ্ম জীব, বিভিন্ন ব্রহ্মান্ড এবং সব জড় বস্তুর মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করেন তাহলে তাঁর মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হতে বাধ্য। তাঁর মতে পরম সত্য অবশ্যই অপরিবর্তনীয়। তাই তিনি নিজকে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ব্যপ্ত করতে পারেন না। যেমন, একখণ্ড কাগজকে যদি বহু অংশে বিভক্ত করা যায় তবে ঐ কাগজখণ্ডের আর পৃথক সত্তা থাকবে না। অনুরূপভাবে পরম সত্য জড় জগতে নিজেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রকাশ করলে তাঁর আর স্বতন্ত্র বা পৃথক সত্ত্বা থাকে না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের উপরোক্ত মতকে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কঠোরভাবে নিন্দা করেন। তাঁরা বলেন পরম সত্যের (পরমেশ্বর ভগবানের) অচিন্ত্য-শক্তি রয়েছে যা জড়-ইন্দ্রিয়ের অতীত। অর্থাৎ মানুষ তার সীমিত জড়-জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অসীম শক্তির ধারণা করতে সত্যিকার অর্থে অক্ষম। এই অসীম শক্তির বলেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে নিহিত করে তারপরও পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান থাকতে পারেন। ঈশ উপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ। ইহা (নামরূপে স্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণ। এই সকল সুক্ষ্ম এবং স্থূল পদার্থ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হতে উদ্‌গত বা অভিব্যক্ত হয়েছে। আর সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্ম থেকে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও পূর্ণই–অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। এককথায় ব্রহ্ম জগদাতীত এবং জগদ্‌ব্যাপী; জন্ম বা সৃষ্টি ব্রহ্মের একত্বের বা পূর্ণত্বের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ তথা দ্বৈতবাদীগণ তাই যুক্তি দেন যে পরব্রহ্ম তথা পরমেশ্বর ভগবান একই সাথে অসীম এবং সসীমরূপে বিরাজ করতে পারেন। যদি তিনি শুধুমাত্র অসীমরূপে স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেন, তবে কিভাবে তিনি তাঁর অংশ সমূহের (জীবাত্মা) সাথে চিন্ময় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন? আবার তিনি যদি নিরাকার এবং একত্বরূপী হন, তাহলে তিনি প্রজাবিহীন একজন রাজার তূল্য হয়ে পড়বেন।

তাই বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলেন, পরমেশ্বর ভগবান হলেন সমস্ত শক্তির মূল বা উৎস-শক্তি। তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন অথবা রূপান্তর হয় মাত্র। কঠো উপনিষদে বলা হয়েছে: "নিত্যো-নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্'' (২/২/১৩)–অর্থাৎ আমাদের যেমন চেতনা আছে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে, পরম তত্ত্বের সর্বোচ্চ স্তরে যিনি সর্বকারণের কারণ, তাঁরও রূপ আছে। তিনি পুরুষ, তিনি ভগবান, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সমস্ত কিছুর উৎস তিনি। এজন্য ব্রহ্ম সংহিতার শুরুতেই বলা হয়েছেঃ–

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্॥''

অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বকারণের পরম কারণ, অনাদির আদি গোবিন্দ এবং সৎ, চিৎ এবং আনন্দের মূর্তবিগ্রহ হলেন তিনিই। ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ সম্পর্কিত উপলব্ধি হল তাঁর সৎ (শ্বাশত সনাতন) বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি মাত্র। পরমাত্মার উপলব্ধি হল তাঁর সৎ-চিৎ (অনন্ত জ্ঞান) রূপের উপলব্ধি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা হচ্ছে তাঁর সৎ, চিৎ এবং আনন্দের অপ্রাকৃত রূপকে পূর্ণভাবে অনুভব করা। (চলবে)

ভক্তি প্রদায়িনী তুলসী দেবী

সর্ব্বৌষধি রসেনৈব পুরা অমৃত মন্থনে।
সর্ব্বসত্ত্বো পকারায় বিষ্ণুনা তুলসী কৃতা ॥
(স্কন্ধ পুরান)

অর্থাৎ- "পুরাকালে অমৃত মন্থন সময়ে জীবকুলের উপকারার্থে শ্রীহরি সর্ব্বৌষধিরস দ্বারা তুলসীর সৃষ্টি করেন।" তারপর কালক্রমে গোলোকে গোপিকা বেশে শ্রীকৃষ্ণের দাসীরূপে কৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত থেকে রাধা শাপে ভারত ভূমিতে মহারাজ ধর্মধ্বজ পত্নী-সাধ্বী মাতা মাধবী দেবীর কোলে কার্তিকী পূর্ণিমায় শুভক্ষণে এক পদ্মিনী কন্যারূপে আবির্ভূতা হন (ব্রঃ বৈঃ পুঃ ১৫৬)। কৃষ্ণ সেবা বিরতা হয়ে থাকায় মন অধির হয়ে উঠল এবং অতি অল্প কাল মধ্যেই নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির মানষে বদরী তপোবনে গমন করে তথায় দৈব গণনার লক্ষ বৎসর ধরে কঠোর তপস্যায় রত থেকে সিদ্ধি লাভ করেন। সিদ্ধি লাভের ফলে প্রথমে তিনি কৃষ্ণ অংগ সমদ্ভুত এবং তাঁরই অংশস্বরূপ অতি তেজস্বী সুদামা নামক গোপ, যিনি রাধিকাশাপে দৈত্যকুল চূড়ামনি শঙ্খচুড় নাম ধারণ করে ত্রিভুবন খ্যাত হয়েছিলেন, তাঁকে পতিরূপে পেয়ে নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং গোবিন্দাশীষে জগৎ পূজ্যা বৃক্ষ রূপা হয়ে আছেন।

কার্তিকী পূর্ণিমাতে জগতের মঙ্গলকর তুলসীর আবির্ভাব (জন্ম) হয়। এজন্য সেই দিন ভগবান শ্রী হরি তাঁর পূজাবিধান করেছেন (ব্রঃ বৈঃ পুঃ ১৮৩)। যিনি এই দিন ভক্তিভরে বিশ্বপাবনী তুলসী দেবীর পূজা করবেন, তিনি অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করতে পারেন। কার্তিক মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তুলসী পত্র দান করলে অযুত গোদানের ফল হয়। তুলসী স্তোত্র স্মরণ মাত্র পুত্রহীন পুত্র, প্রিয়াহীন, প্রিয়া, বন্ধুহীন বন্ধু লাভ করেন।

তাছাড়া রোগী রোগ হতে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হতে, ভীত-ভয় থেকে ও পাতকী পাতক বা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

তুলসীর পাপনাশন ধ্যান

সতী তুলসী পুষ্পসারা, পূজ্যা ও মনোহরা। তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখার মত সমস্ত পাপরূপ কাষ্ঠের দহনকারিনী। সমস্ত দেবীগনের মধ্যে যিনি পবিত্র রূপা এবং যাঁর তুলনা নাই, তিনি তুলসী নামে কীর্তিতা হন। যিনি সকলের প্রার্থনীয়া, শিরোধার্যা এবং যিনি বিশ্বপাবনী নামে প্রসিদ্ধা, সেই মুক্তি ও হরি ভক্তিদায়িনী জীবন্মুক্তা তুলসীকে ভজনা করি।

পন্ডিত ব্যক্তিগণ এইরূপ ধ্যান করে পূজা শেষে স্তুতি পাঠ ও প্রণাম করেন।

তুলসীর গুণ তত্ত্ব

ভগবান শ্রীহরি তুলসীকে বরদান পূর্বক অঙ্গীকার করে বলেছেন- (১) তুলসীই যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হতে দেবপূজায় প্রাপ্ত হবে। (২) স্বর্গ-মর্ত্য, পাতাল, বৈকুণ্ঠ ও হরি সন্নিধানে তুলসীবৃক্ষ সকল পুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ হবে। (৩) পুন্যপ্রদ তুলসীবৃক্ষ গোলকের বিরজা তীরে, রাসমন্ডলে, বৃন্দাবন ভূমিতে, ভান্ডীর বনে, রমনীয় চম্পকবনে, চন্দন কাননে, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মল্লিকা ও মালতী বনে এবং অন্যান্য যাবতীয় পুন্যস্থানে উৎপন্ন হবে। (৪) পুন্যপ্রদ তুলসী বৃক্ষমূলে সকল তীর্থের অধিষ্ঠান হবে। সেই স্থানে সমস্ত দেবগন পতিত তুলসী পত্রের প্রত্যাশায় অধিষ্ঠান করবেন। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র জলে অভিষিক্ত হবেন, তিনি সকল তীর্থস্থান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করবেন। সুধাপূর্ণ সহস্র ঘঠদানে হরির যে প্রীতি না হয়, মানবগণ এক তুলসীপত্র প্রদানে সেই প্রীতি সম্পাদন করবে। মনুষ্যগণ অযুত গোদান করে যে ফল লাভ হয়, এক তুলসীপত্র দান করে সেই ফল লাভ করবে, মৃত্যুকালে যিনি তুলসীপত্রের জল প্রাপ্ত হবেন, তিনি সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করবেন। যে মানব নিত্য তুলসী পত্রের জল পান করবেন, তিনি জীবন্মুক্ত হয়ে গঙ্গাস্নানের ফল ভাগী হবেন। যে মানব নিত্য তুলসী পত্র দ্বারা শ্রীহরির পূজা করেন, নিশ্চয় তাঁর লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের পূণ্য হবে। মনুষ্যগণ দেহে তুলসী ধারণ করে দেহত্যাগ করলে বিষ্ণুলোকে গতি হবে। যে মানুষ তুলসী কাষ্ঠ নির্মিত মালা ধারণ করবে, তার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তুলসীজলের কনামাত্র প্রাপ্ত হবে সে বৈকুণ্ঠে গমন করবে। তুলসী মালা ধারণকারীকে কখনও যমদূত স্পর্শ করতে পারে না। তুলসী ধারণ/স্পর্শ করে মিথ্যা শপথ বা অঙ্গীকার করা মহাঅপরাধ।

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি দিবসে, তৈলযুক্ত হয়ে স্নানের সময়, মধ্যাহ্নে, রাত্রিকালে, উভয় সন্ধ্যাকালে, রাত্রিবাস (বাসী কাপড়) পরিধান করে তুলসী চয়ন করলে শ্রীহরির শিরচ্ছেদ করার অপরাধে অপরাধী হতে হবে।

তুলসীপত্র ত্রিরাত্রি পর্যুষিত (বাসি) হলেও, তা-শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেব পূজাদি এবং অন্যান্য কার্যে শুদ্ধ হবে। ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তুলসীপত্র মৃত্তিকা বা জলে পতিত হলেও তা প্রক্ষালন করলে অন্যান্য কার্যে শুদ্ধ হবে।

শালগ্রাম শিলা, নারায়ণ শিলা, তুলসী ও শঙ্খকে যিনি একস্থানে রাখেন তিনি মহাজ্ঞানী ও শ্রীহরির অতি প্রিয় হবেন।

তুলসী কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী, ভক্তিদেবী। নিত্য নববিধা তুলসী সেবা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। নববিধা তুলসী ভজনা হল- (১) দর্শন, (২) স্পর্শন, (৩) ধ্যান, (৪) গুণকীর্তন, (৫) প্রণাম, (৬) গুণশ্রবণ, (৭) রোপণ, (৮) জলপ্রদান, (৯) পূজা ইত্যাদি নয় প্রকার তুলসীর নিত্য ভজনা - কর্তার সহস্রকোটী যুগ বিষ্ণুলোকে বসতি লাভ হয়।

তুলসী গুণকীর্তন ও মাহাত্বের বর্ণনার কোন শেষ হয় না, তবুও সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনার বিশ্রাম রাখতে হয়- কাল প্রবাহের কারণে।

অবশেষে প্রণতি রইল তুলসী চরণে-
ভক্তি দানিতে এ বিশ্ব জগতে
তোমার মতন কেবা আছে আর।
নমো নমো নমঃ বৃন্দে মহারাণী
নমো নমো নমঃ চরণে তোমার ॥

-শ্রী চৈতন্য শিক্ষা নিকেতন (গুরুকুল)
শিববাড়ী, খুলনা।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে আপনি গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

-প্রেমাঞ্জন দাস

গৃহস্থ সদাচার

সূর্যবংশীয় রাজা সগর তাঁর গুরুদেব ঔর্বমুনিকে বলেছিলেন, "হে মুনিবর, যে সদাচার অনুষ্ঠান করলে গৃহস্থজন ইহলোক ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্মচ্যুত না হয়, সেই সব সদাচার শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।"

উত্তরে ঋষি ঔর্ব বলেছিলেন, "হে রাজন, সদাচার পরায়ণ মানুষ ইহলোক ও পরলোক জয় করে থাকে। সৎ আচার। সৎ শব্দের অর্থ সাধু। যাঁরা দোষশূণ্য, তাঁদেরই সাধু বলা হয়। সেই সাধুদের যে আচার, তার নাম সদাচার। সপ্তর্ষিগণ, মনুগণ ও প্রজাপতিগণ এই সদাচারের বক্তা ও কর্তা। আমি তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করছি শ্রবণ করুন।"

"ব্রাহ্মমুহূর্তে (ভোরের বেলায়) সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি জেগে উঠবেন। বিছানায় পড়ে থাকবেন না। দুই সন্ধ্যাকে তাঁরা নমস্কার জানাবেন।"

ভক্তগণ দুই সন্ধ্যা-ভোরের মঙ্গল আরতি ও সাঁঝের সন্ধ্যা আরতিতে যোগ দিয়ে আরতি, কীর্তন- জপ ভজন সাধনে নিমগ্ন থাকেন।

ঋষি ঔর্ব বললেন, "গৃহস্থ ব্যক্তি অর্থ ও কাম চিন্তা করেই থাকেন। কিন্তু সেই অর্থ ও কাম সর্বদাই ধর্ম অবিরুদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্ম বিরুদ্ধ অর্থ ও কামচিন্তা অমঙ্গলকর। তাই তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যে ধর্ম পরিণামে অসুখকর বা সমাজবিরুদ্ধ বা অন্য প্রাণীর উদ্বেগ বা মৃত্যুর কারণ সেই রকম ধর্ম-অনুষ্ঠান করা উচিত নয়।

অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীন সমাজে দেখা যায় কারও গৃহে যাওয়ার সময় প্রথমেই মলমূত্রের দুর্গন্ধ নাকে ঢোকে। এতে গৃহস্থের অমঙ্গলই সঞ্চিত হয়। তাই ঔর্বঋষি বলছেন, বাসস্থান থেকে দূরে মলমূত্র বিসর্জন করা উচিত। এমনকি পা ধোওয়ার জল, এঁটো জিনিষ ঘরের অঙ্গনে ফেলা উচিত নয়। তিনি আরও বললেন, নিজের ছায়াতে, গাছের ছায়াতে, সূর্য চন্দ্রের অভিমুখে, গুরু, গো, ব্রাহ্মণ, বায়ু, অগ্নির সম্মুখে, জলমধ্যে, নদীতে জলাশয় তীরে, শ্মশানে, শস্যক্ষেত্রে মলমূত্র পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। অন্যথায় নানাবিধ জটিল সূক্ষ্মব্যাধি আক্রমণ করে থাকে। সেকথা অন্যত্র বলা হয়েছে। গৃহস্থ ব্যক্তি অছিন্ন, পরিষ্কার বসন পরিধান করবেন এবং তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণ করবেন।

ঔর্বমুনি বললেন, গৃহস্থগণ কখনও কিছুমাত্র পরস্ব হরণ করবেন না। কাউকে অল্পমাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলবেন না। মিথ্যা প্রিয় বাক্য ব্যবহার করবেন না। অন্যের দোষ বর্ণনা করবেন না। হে রাজন্, গৃহস্থ ব্যক্তি অন্যের সম্পদ দেখে কখনও লোভ করবেন না। কারও সঙ্গে শত্রুতা করবেন না। যারা খলচরিত্র, পতিত, উন্মাদ, যার বহু শত্রু রয়েছে, হিংস্র অঞ্চলের বাসিন্দা, বেশ্যা, বেশ্যাপতি, অতি দাম্ভিক, মিথ্যাবাদী, অতি ব্যয়কারী, পরনিন্দা পরায়ন, শঠ–এই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে মিত্রতা করবেন না। এ সমস্ত মানুষদের পন্থা আশ্রয় করবেন না। দাঁত কড়মড় করে কথা বলা উচিত নয়। হাই তোলা বা কাশি-হাঁচির সময় মুখ-নাক ঢাকা দেওয়া কর্তব্য।

গৃহস্থব্যক্তি রাত্রে শয়নকালে হাত পা ধোয়ামোছা করে শয়ন করবেন। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে মাথা থাকবে। পশ্চিম ও উত্তরশিরা হয়ে শয়ন করলে রোগ হয়। তাঁরা প্রতিদিন নিয়মিত সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন পাঠ-আলোচনা করবেন। আরাধ্য দেবতা. গো-জাতি, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, বৃদ্ধ আচার্যগণের তাঁরা সেবা করবেন। তাতে তাঁদের কল্যাণ সাধিত হবে।

আসক্তি কোন্ দিকে ?

বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীর সতীত্ব এবং পতিভক্তির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পতির প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে, একজন স্ত্রী পরবর্তী জীবনে একটি পুরুষ শরীরে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কোন পুরুষ যদি আসক্ত হয়, তা হলে তার অধঃপতন হবে, এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি স্ত্রী-শরীর প্রাপ্ত হবে।

ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে, আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই প্রকার জড় শরীরই হচ্ছে পোশাকের মতো, সেইগুলি জীবের শার্ট এবং কোটের মতো। স্ত্রী হওয়া অথবা পুরুষ হওয়া কেবল পোশাকের ভেদ মাত্র। আত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। প্রতিটি জীবই ভগবানের শক্তি হওয়ার ফলে, প্রকৃতপক্ষে সে স্ত্রী, বা ভোগ্য। পুরুষ-শরীরে ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অধিক সুযোগ পাওয়া যায়, এবং স্ত্রী-শরীরে সেই সুযোগের মাত্রাটি কম। স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়ার দ্বারা, পুরুষ-শরীরের অপব্যবহার করা উচিত নয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে একটি স্ত্রী-শরীর ধারণ করতে হবে। স্ত্রী সাধারণত গৃহের উন্নতি, গয়না, আসবাবপত্র এবং সাজ-পোশাকের প্রতি অনুরক্ত। পতি যখন এই সমস্ত জিনিসগুলি যথেষ্টভাবে সরবরাহ করে, তখন সে সন্তুষ্ট হয়।

পুরুষ এবং স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে, যারা পারমার্থিক উপলব্ধির দিব্য স্তরে উন্নীত হওয়ার অভিলাষী, তাদের স্ত্রীসঙ্গ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির স্তরে এই নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা যেতে পারে, কারণ পুরুষ এবং স্ত্রী যদি পরস্পরের প্রতি আসক্ত না হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তাঁরা উভয়েই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সমানভাবে যোগ্য। ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনকারী যদি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত হন অথবা স্ত্রী হন অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বৈশ্য বা শূদ্র কুলোদ্ভূত হন, তাতে কিছু যায় আসে না-তাঁরা তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যাবেন। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়, এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীরও আসক্ত হওয়া উচিত নয়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হওয়া। তা হলে তাঁদের উভয়েরই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ●

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

উপদেশে উপাখ্যান

উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

উদ্ধব সিং নামে উদ্ধত প্রকৃতির এক ব্যক্তি ছিল। তার একটি ঘোড়ার গাড়ি ছিল। তার একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি একদিন দুপুর বেলায় গাছ কাটছিল। অসতর্কভাবে কুড়ুল চালাচ্ছিল। কুড়ুলটির বাঁট হঠাৎ সজোরে তার নাকে এসে লাগল। নাক ফেটে প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগল। অচেতন হয়ে সে মাটিতে পড়ে রইল। তখন তার বাবা এসে অতি ব্যস্ত হয়ে ছেলের নাকে-মাথায় জল ঢালতে থাকে। গতিক খারাপ দেখে তাড়াতাড়ি ছেলেকে ঘোড়ার গাড়িতে তোলে। সিংজীর ভৃত্য ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। ঘোড়াটি ছিল অসুস্থ। তার একটি পায়ে ব্যথা ছিল। তবুও ঘোড়াটিকে গাড়িতে জোড়া হল। দ্রুত ছোটার জন্য উদ্ধব সিং ঘোড়াকে চাবুক মারতে থাকে। মরি পড়ি করে ঘোড়া দৌড়াতে থাকে। মাঝপথে গিয়ে ঘোড়াটি হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যায়। রোগী-সহ ভৃত্যটি মাটিতে উল্টে পড়ে। রোগী মারা যায়। উদ্ধব সিং তখন প্রচণ্ড ক্রোধে ঘোড়াকে পেটাতে থাকে। ভৃত্যটি বলে- "বাবু, বুধোকে মেরে আর কী লাভ ? এখন অন্য কিছু করুন।" ঘোড়াটির নাম ছিল বুধো। উদ্ভব সিং বলতে থাকে "না, না, এই ঘোড়াটার জন্যই আমার ছেলেটা মারা গেল। আর একটুখানি পথ গেলেই হাসপাতালে পৌছতে পারতাম। ঘোড়াটাকে মারলেই ওর উচিত দণ্ড হবে।" পথিকেরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "আরে আরে, করছো কি ? ঘোড়াটা যে মরে যাবে।" পথিকেরা ধমক দিয়ে উদ্ধবকে বলে-"যা, তোর ছেলেকে নিয়ে এখন নিজে দৌড়ে যা হাসপাতালে। নিরীহ ঘোড়াটাকে মারলে কি ছেলে জ্যান্ত হয়ে যাবে ?" পথচারীরা প্রশ্ন করে-"কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?" একজন বলে- "ওর নাম উধো সিং। ও তার ছেলের মৃত্যুর জন্য ঘোড়ার ওপর দোষ চাপাচ্ছে। ঐ উধো তার পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।"

হিতোপদেশ

নিজের সমস্যা মোকাবিলার জন্য অন্যায়ভাবে অন্যকে বিপদে ফেলা বা অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাবটি দুর্বৃত্তদের লক্ষণ। বিবেকবান মানুষ জানেন যে, নিজ স্বার্থের জন্য নিরপরাধ ব্যক্তিদের কষ্ট দেওয়া মহাঅপরাধ।

ময়ূরপুচ্ছধারী কাক

এক জায়গায় ময়ূরের কতকগুলি রঙ্গিন পালক পড়েছিল। এক কাক সেগুলি দেখতে পেল। সে মনে মনে ভাবল, "আমি যদি এই পালকগুলি আমার শরীরে গুজে দিয়ে ময়ূরের মতো হতে পারি, তা হলে ভাল হবে লোকে আমাকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা জানাবে। আর সমস্ত কাকজাতির উর্দ্ধে আমার স্থান হবে।"

সে রঙ্গিন পালক নিজের লেজ ও ডানার পাখনায় গুঁজে দিতে লাগল। তারপর গাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসল। তার সেই রকম বেশ দেখে কতকগুলো কাক জড়ো হল। তারা বলাবলী করতে লাগলো "ওর পাখনাগুলো এত সুন্দর হল কি করে ?"

তখন গর্বভরে সেই কাক বলল, "তোরা কি জানিস্। আমি অনেক তপস্যা করেছি। তোরা তো কদর্য কালো রঙটা ছাড়তেই পারলি না।

আমি এই কালো রঙ্গ পছন্দ করি না, আমাকে কালকেই দেখবি সারা শরীর রঙ্গিন করব তপস্যার জোরে। সেই সব বহু জ্ঞানচর্চার ব্যাপার। তোদের মগজে এত কিছু ঢুকবে না। দেখিস্ ওই ময়ূরগুলো বহুজনের আকর্ষনীয়, আমি এমন প্রয়াস নিয়েছি যাতে সমস্ত বড় বড় ময়ূরের সৌন্দর্য হারিয়ে আমি আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হব।"

অন্যান্য কাকেরা মনে করল, "হয়তো সত্যি তাই হবে।" কাকটি তাদের বলতে লাগল, "কালকে তোরা আমার কাছে আসবি। আমার নির্দেশ মতো তোরা চলবি, নইলে তোদের বিপদ আছে।" তাকে সবাই সেদিন সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

পরদিন কাকেরা এসে দেখল, "কয়েকটি ময়ূর এসে কাকটির মাথায় ঠোকর দিচ্ছে। কাকের গায়ে রঙ্গিন পালকগুলিও ময়ূরেরা খুলে দিয়েছে। কাকটি 'মরে গেলাম রে' বলে চেঁচাচ্ছে আর দৌড়ে পালাচ্ছে।" অন্যান্য কাকেরা তার দুরবস্থা দেখে বলাবলি করতে লাগল, "দেখেছো, ও গতকাল কিরকম গুরুগিরি করছিল, আর পড়িমরি করে পালাচ্ছে। অথচ গতকাল আমাদেরকে জ্ঞানদান করবে বলে খুব লম্বা লম্বা কথা বলছিল। ওটা আমাদের কাকজাতির কলঙ্ক। ওকে ময়ূরেরা তাড়াচ্ছে, আমরাও তাড়াবো।" এইভাবে দুই দল থেকেই কাকটি তাড়া খেতে লাগল।

হিতোপদেশ

সমাজে নিজ নিজ যোগ্যতা ও গুণ অনুসারে কর্ম করতে হয়। প্রত্যেকের জীবনে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। 'আমিই উচ্চ ব্যক্তি' এই গর্ববোধে অন্যকে হেয় মনে করে যারা চলে তাদের অবস্থাটা ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মতোই হয়। পরিণামে সে সাধারণ ব্যক্তির কাছেও হেয় হয়ে যায়। ●

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে ছুবায় ॥

চিঠিপত্র

প্রশ্ন (১) ভারত থেকে কতিপয় প্রভুপাদ বা গোস্বামী উপাধিধারা বৈষ্ণব এদেশে এসে নিজেদের নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রভুর বংশের অধস্তন বলে দাবী করেন এবং অনেক লোককে দীক্ষা দেন। উল্লেখ থাকে যে, তারা অনেক মাছ-মাংসাহারী লোককে দীক্ষা দেন। তাদের বিষয়ে জানতে চাই।

প্রশ্নকর্তা- মহামায়া দত্ত, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়, সিলেট।

উত্তরঃ- মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত না হয়ে প্রভুপাদ হওয়া যায় না। আবার মহাপ্রভুর দাস না হয়ে গো-দাস বা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে 'গোস্বামী' উপাধি ধারণ আধ্যাত্মিক বিড়ম্বনা। এছাড়া অধিকাংশ প্রভুপাদ বা গোস্বামী উপাধিধারীরা স্বঘোষিত বা শিষ্য ঘোষিত। যোগ্যতা বিচারে তারা প্রভুপাদ বা গোস্বামী নন্।

জাত্যাভিমান, উচ্চবর্ণের অহংকার আর বংশ গৌরবের দম্ভ হিন্দুদের হীন করেছে। পারমার্থিক অজ্ঞতার গভীরে ঠেলে দিয়েছে হিন্দু জাতিকে। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য প্রভু, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপরিকর। ভগবান স্বপার্ষদ অবতীর্ণ হন এবং লীলা সাঙ্গ হলে পরিকরসহ অপ্রকট হন। শৌক্র জন্ম হয়ে যারা নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রভুর বংশ পরিচয়ের ঢক্কা বাজিয়ে গুরুগিরী করছে সেটা তাদের শিষ্য বাড়ানোর কু-মতলব এবং উদর ভরন-পোষনের এক কুট কৌশল। নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রভুর বংশের মার্কা গায়ে লাগিয়ে "অচ্যুতগোত্র-অভিমানে, ভিক্ষা করেন সর্বস্থানে, টাকা-পয়সা গণি, ধ্যানে" ধারণা প্রচুর। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। আপনার প্রশ্নেই তাদের কূট কৌশলের ইঙ্গিত আছে- আর তা'হল মাছ-মাংসাহারী ব্যক্তিদের দীক্ষা প্রদান, যিনি যথার্থ গুরু তিনি কখনও মাছ-মাংসাহারী লোকদের দীক্ষা দেবেন না–দলভারী করার জন্য, ধুতি-গামছা দক্ষিনা পাওয়ার জন্য। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, অদ্বৈত ঠাকুর প্রসঙ্গে বলেছেন, যাহারা তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন বলে অভিমান করেন, তাঁদের মধ্যেই বা কয়জন তাঁর তত্ত্ব অবগত আছেন? অন্যের কথা কি? যারা আচার্য-প্রভুর বংশধর বলে পরিচয় প্রদান করেন, তাদের মধ্যেও অধিকাংশই ন্যূনাধিক মায়াবাদীর বিচার গ্রহণপূর্বক আচার্য-চরণ হতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত। তাঁরা নিজদিগকে ভক্তির প্রচারক বলে পরিচয় প্রদান করলেও সুদার্শনিকগণের দর্শনে তাদের অন্তরস্থিত মায়াবাদ গহ্বর প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শৌক্রবংশধারায় বর্তমানকাল পর্যন্ত আসবার প্রয়োজন নাই। তিনি আরও বলেছেন, শ্রীঅদ্বৈতচার্যের বংশে অদ্বৈতসেবা প্রবৃত্তিতে বিপর্যয় ঘটায় তাহার অধস্তনগনের ও অধস্তনের অনুগত জনগণের অনেকেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করতে গিয়া অতিবাড়িগণের ন্যায় বৈষ্ণব-সমাজ হতে নিত্যকালের জন্য বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন।

প্রশ্ন (২) শাস্ত্রে সাধু বা বৈষ্ণবের যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাথে মিলালে অধিকাংশ সাধু-বৈষ্ণব বাদ পরে যায়। ছোট খাটো দোষ-মিথ্যা বলা, মাছ-মাংস খাওয়া, চা,পান, বিড়ি খাওয়া, একাদশী না করা ইত্যাদি ছাড়া সাধু মিলে না। এখন তাদের দিয়ে সাধু বা বৈষ্ণব সেবা দিলে নূন্যতম কোন ফল পাব কি? যদি না পাই তবে এর বিকল্প উপায় কি?

প্রশ্নকর্তা-কিরণ চন্দ্র হালদার, পারফেক্টটেক্সটাইল, সেন্টারপাড়া, পটুয়াখালি।

উত্তরঃ- 'ইমিটেশন' অলংকারের ন্যায় হরেক রকমের 'ইমিটেশন সাধু' দেখা যায়-তাদের গুণ, কর্ম এবং বৈশিষ্ট্যের বিচার করলে তারা সাধুর সারি থেকে বাদ পরে যাওয়ারই কথা। কলিযুগতো, তাই নকল সাধুর 'ইম্পোর্ট' হচ্ছে সাধুর রাজ্যেও।

লিখেছেন ছোট-খাটো দোষ, না, ওগুলি ছোট-খাটো দোষ নয়, পারমার্থিক প্লাটফরমে ওগুলিই মহাদোষ। (১) মিথ্যা বলাঃ- যে সাধু হয়েও মিথ্যা বলতে পারে সে-তো মিথ্যাচারী এবং ভন্ড। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে। গীঃ ৩/৬॥ (২) মাছ-মাংস খাওয়া-যে সাধুর লেবাস গায়ে লাগায়ে মাংস খায়, সেতো মাংস খাদক। যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তম্মাংসাদ উচ্যতে। সে সাধুবেশী নর রাক্ষস। আর যে মাছ খায়- সে সর্বমাংস ভোজী। সর্ব মাংসভুক। মনুঃ ৫/১৫॥ (৩) চা, পান, বিড়ি খাওয়া; এটাতো নেশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের স্বভাবজ কর্ম। সাধুর কর্ম নয়। (৪) একাদশী না করা ঃ- যে একাদশী করছে না, সে সর্বপাপ ভোজনকারী। যেহেতু একাদশীতে পাপসমূহ অন্নতে আশ্রয় করে থাকে। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। নাঃ পুঃ ২১/৮॥

এবার আপনিই বিবেচনা করুন অমন পাপাচারী-অনাচারী সাধুনামধারীদের সেবা করলে কোন ফল পাবেন কি? না কি কেবল অর্থের অপচয় হবে?

আর হ্যাঁ, এর বিকল্প আছে, সোজা চলে যান গৌড়ীয় মিশনে, ইস্কন মিশনে, নামহট্ট মিশনে। তাহলে বৈষ্ণব সেবা নিয়ে ভাবনা–আর না, আর না। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন (৩) পুরোহিত দর্পন-এর যে সব মন্ত্র ও নিয়মকানুন অনুসরন করে যজমানী ব্রাহ্মণ (যাদের কোন সাত্ত্বিকতা নেই) দ্বারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত ও পূজা-পার্বন করাচ্ছি সেগুলো কি সনাতন ধর্মশাস্ত্র মতে সঠিক হচ্ছে? না হলে এর বিকল্প পথ কি?

প্রশ্নকর্তা : কিরন চন্দ্র হালদার, সেন্টারপাড়া, পটুয়াখালী।

উত্তরঃ 'পুরোহিত দর্পন'- এর অস্বচ্ছ আয়নায় অধিকাংশ মন্ত্র ও নিয়ম কানুন শাস্ত্রীয় বিচারে প্রতিফলিত হয়নি। এখন হিন্দু সমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি পালনে যে নিয়ম-নীতি পালন করা হয়, তার প্রায় সবটাই কুসংস্কার। এছাড়া 'পুরোহিত দর্পন'-এর বিধান অনুসারে তথাকথিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা যে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন, তার একশ ভাগই দায় সারা। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পুরুতদের সাত্ত্বিকতা নেই, সদাচার সম্পন্ন নয়, মালা, তিলক ধারন করে না, কৃষ্ণনাম জপ করে না তাদের দ্বারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন এবং পূজা পার্বনাদি যা কিছু করাবেন সবই বৃথা। সবই ব্যর্থ হবে। **ব্যর্থং ভব তৎ সর্বম্**। পঃপুঃ॥ আর প্রায়শ্চিত্ত তথাকথিত জাত ব্রাহ্মনদের কারও প্রায়শ্চিত্ত করার যোগ্যতা নাই। বরং সেই সব ব্রাহ্মনদেরই প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত, যারা ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহন করেও পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের দাস না হয়ে ইন্দ্রিয়ের দাস হয়েছে।

শ্রাদ্ধ বিবাহাদি বিষয়ের নিয়মকানুন জানতে হলে আপনি গৌড়ীয় মঠ বা চৈতন্য মঠ-এর প্রকাশিত গ্রন্থ 'সৎক্রিয়া সার দীপিকা' এবং 'সৎ ক্রিয়া সার পদ্ধতি' এই দুইটি গ্রন্থ পড়তে পারেন। আর নয়তো ইস্‌কন-এর কোন প্রবীন বিজ্ঞজনের সাক্ষাতে আসতে পারেন।

প্রশ্ন (৪) ক)ঃ কল্কি অবতার কি ? কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি আবির্ভূত হয়ে সবাইকে নিহত করলে তখন পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে ?

(খ) পরিবার, জাতি, সমাজ, দেশ, পশুপাখি সেবা করাই ধর্ম, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসব ধর্ম বর্জন করে তাঁর শরণ নিতে বলেছেন কেন ?

প্রশ্নকর্তা ঃ- উদয়শংকর সরকার, সাহাপুর, খুলনা।

উত্তর (ক) ঃ অপ্রাপঞ্চিক জগৎ থেকে প্রাপঞ্চিক জগতে তত্ত্ববস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কলা, আবেশ অবতরণই অবতার। ভগবান বিভিন্ন নামে অবতীর্ণ হন। সে বিষয়ে আবির্ভাবের পূর্বেই ভবিষ্যদ্বানী থাকে। তেমনি 'কল্কি' হচ্ছেন কল্কিনামক ভগবানের ভাবি অবতার। গ্রন্থচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র জানায়- **'যুগসন্ধ্যায়াং দস্যু প্রায়েসু রাজসু'** যুগের সন্ধিক্ষনে অর্থাৎ কলিযুগের শেষান্তে রাজা-রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীরা যখন স্বেচ্ছাচারী দস্যুপ্রায় হবে তখন **'জনিতা বিষ্ণুযশ সো নাম্না কল্কির্জৎপত্তিঃ** ভগবান 'কল্কি' নাম ধারণ করে যশস্বী বিষ্ণুযশ নামক ব্রাহ্মনের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি যেই গ্রামে অবতীর্ন হবেন, সেই গ্রামের নাম 'সম্ভল'। তিনি আজ থেকে ৪,২৭,০০ হাজার বছর পর আবির্ভূত হবেন। আবির্ভূত হয়ে দস্যুপ্রকৃতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংহার করে পুনরায় ধর্মসংস্থাপন করবেন। আর যারা সেই কাল অবধি ধর্মপরায়ন হয়ে থাকার সৌভাগ্যলাভ করবেন তাদেরকে দিয়েই আবার সূচনা হবে সত্যযুগের।

উত্তর (খ) ঃ- শংকর বাবু, 'ধর্ম' সম্বন্ধে আপনার ধারনা পরিচ্ছন্ন নয়। পরিবার পরিজন ভরন- পোষন পারিবারিক দায়িত্ব, জাতি দেশ রক্ষনাবেক্ষন নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব, সমাজ রক্ষা সমাজপতিদের কর্তব্য, পশু-পাখি হত্যা না করা অহিংসানীতি।, এগুলি পালনে নৈমিত্তিক পূর্নকর্ম সম্পাদিত হয়। এতে পূণ্য সঞ্চয় হয়। ধর্ম বলতে যা বোঝায় তার সহস্রের একাংশ এই পুণ্য কর্মাদি। আবার এই পূণ্যকর্ম নিত্যও নয়। অনিত্য।

ধর্মের সংজ্ঞা নিরুপনে শাস্ত্র জানায়, **'বেদপনিহিতো ধর্মোহ্য ধর্মস্তদ বিপর্য্যয়ঃ'** বেদবিহিত আচরনই ধর্ম, তার বিপর্যয়ই অধর্ম। মানবের ধর্ম কি সে বিষয়ে ভাগবত সিদ্ধান্ত- **'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে'**- অর্থাৎ সমস্ত মানুষের পরম ধর্ম হচ্ছে অধোক্ষজতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করা। যা অহেতুকী এবং অপ্রতিহতা। সিদ্ধান্ত আরও বলে, **'ধর্ম তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রনীতম্'**- ধর্ম ঐশী আইন। ভগবানের আইন পালনই ধর্ম। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এটিই ধর্ম। সেই সুবাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল ধর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে ঘোষনা দিলেন, 'Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. অর্থাৎ **'সর্ব ধর্ম ত্যাগি লও আমার শরণ।'** গীঃ ১৮/৬৬॥

প্রশ্ন (৫) ঃ অন্যদেব-দেবীর পাশাপাশি কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম নিলে কোন সমস্যা আছে ?

প্রশ্নকর্তা-কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, দেবল, কিশোরগঞ্জ।

উত্তরঃ না, কোন সমস্যা নেই। তবে জেনে রাখা ভাল যে, দেব-দেবীর নাম গ্রহণে যে পূণ্যার্জিত হয়, তা কালের গতিতে বিনষ্ট হবে। পুন্য অর্জন করে স্বর্গ বা দেবলোকে গমন করলেও আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। **মর্ত্যলোকং বিশন্তি**। গীঃ ৯/২১॥ চিরকাল স্বর্গেও থাকা যাবে না। স্বর্গেও শান্তি নাই। কিন্তু কৃষ্ণনাম গ্রহণে জীবের যে পূণ্য বা সুকৃতি অর্জিত হয় তা নিত্য। নিত্যানন্দময়। নশ্বররহিত। কৃষ্ণনাম গ্রহনকারী শুদ্ধ ভক্তদের আর এ জগতে আসতে হয় না।

লিখেছেন, দেব-দেবীর পাশাপাশি কৃষ্ণনাম গ্রহণ; এক্ষেত্রে কৃষ্ণনাম গ্রহণকে গৌন হিসাবে ধরেছেন। মূখ্য হিসাবে কৃষ্ণনাম গ্রহনকারীকে অন্য দেব-দেবীর নাম গ্রহনের প্রয়োজন হয় না। কেননা সিদ্ধান্ত জানায়-**'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।'**

প্রশ্ন (৬) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে,

জীবের নিস্তার লাগি নন্দসূত হরি।

ভূবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥

নন্দসূতই যদি জগতে গুরুরূপে আসেন তবে গুরুদেবকে কেন-শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য বা ভগবান বলা যাবে না ?

প্রশ্নকর্তা- মদন মোহন বর্ম্মন চাপারহাট, লালমনিরহাট।

উত্তরঃ- 'জীবের নিস্তার লাগি........'এই দ্বৈত লাইন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নয়। তবে এর উত্তরে বলি, যদিও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ স্বরূপ শ্রীগুরুদেব; তবু তিনি কৃষ্ণ, চৈতন্য বা ভগবান নন। গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, ভক্তশ্রেষ্ঠ এবং প্রতিনিধি। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ বলেছেন –

শচীসুতং নন্দীশ্বর পতি সুতত্বে গুরুবরং।
মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং তনু মনঃ॥

শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিকে শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন জেনে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ জেনে স্মরণ করবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও লিখেছেন, **'প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য'**- অর্থাৎ গুরুদেব ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠজন। এবং তিনি ভগবানের মতই পূজনীয়। তবে ভগবান নন। ভগবান থেকে অভিন্ন হলেও, শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬) জানায়েছেন, **'ভগবতাসহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে'** অর্থাৎ শাস্ত্রে যে যে স্থানে গুরুদেবকে ভগবানের সাথে অভিন্ন বলা হয়েছে সেই সেই স্থানে গুরুদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম বলে মনে করতে হবে। ভগবান বলা যাবে না।

প্রশ্ন (৭) ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা পূর্ব জন্মে রাক্ষস ছিল। তাহলে ইস্‌কন এর মধ্যে যে ব্রাহ্মনেরা আছেন তারা কি ?
প্রশ্নকর্তা ঃ রুবেন চন্দ্র বিশ্বাস, শাইলকান্দি, সিলেট।

উত্তর ঃ বরাহ পুরানে কলিকালের ব্রাহ্মণ সমাচার প্রসঙ্গে এরূপ উক্তি আছে যে, **'রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু'** অর্থাৎ রাক্ষসেরা কলিযুগে আশ্রয় করে ব্রাহ্মন কুলে জন্মগ্রহন করেন। এবং **'বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্'**- জন্মগ্রহণ করে শ্রৌতপথজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বাধাপ্রদান করেন। তাদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন-

কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র-ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬/৩০০।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণেয় (বৈষ্ণব) হিংসাকারী রাক্ষস স্বভাবের মানুষেরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহন করেও বৈষ্ণবের সাথে হিংসা করে। এটা কলিযুগের কলুষিত হওয়ার প্রভাব। তবে কলিকালের সকল ব্রাহ্মণ পূর্বে রাক্ষস ছিল, এমন কথা শাস্ত্রে বলা হয় নাই। আর 'ইস্‌কন' হচ্ছে ব্রাহ্মণ তৈরীর গবেষনাগার। এখানে যোগ্যতা অনুসারে ব্রাহ্মণের অধিকার প্রদান করা হয়। যখন কেউ কৃষ্ণভক্ত হয়ে যায়, তখন সে রাক্ষস কুলে জন্মগ্রহণ করলেও তার আর রাক্ষস স্বভাব থাকে না। আবার কোন রাক্ষস যদি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহন করে কৃষ্ণভক্ত হয়, তখন সে রাক্ষস হিসাবে বিবেচ্য নয়।

প্রশ্নোত্তরে - শ্রী মনোজ কৃষ্ণ দাস।
দিনাজপুর

(২১ পৃষ্ঠার পর)

উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বান্দরবনবাসী তার দিব্য অনুভূতির সংস্পর্শে আবেগে ও প্রেমে মাতোয়ারা হন।

মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রা ও ছিল মোড়ে মোড়ে, সুসজ্জিত মঞ্চ ও রাজকীয় হস্তী প্রদর্শনী ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দুপুর ও রাত্রে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা ছিল।

হাট হাজারীতে শ্রীশ্রী পুন্ডরিক বিদ্যানিধির ৫২৬ তম শুভ আবির্ভাব তিথি পালিত ঃ

কলির পতিত পাবন মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ শ্রীশ্রী পুন্ডরিক বিদ্যানিধির ৫৩৬ তম শুভ আবির্ভাব তিথি পালিত হল।

গত পহেলা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী ০৫ইং ইসকন জিবিসি ও গুরুবর্গের অন্যতম প্রধান শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সর্বস্তরের ভক্ত ও সুধীজনের মঙ্গল বিধান করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষন ছিল শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কর্তৃক শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও হরিনাম দীক্ষানুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ইসকন জিবিসি শ্রীল ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ ও ইস্‌কন বাংলাদেশের সাধারন সম্পাদক শ্রীমৎ চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল ধর্মীয়সঙ্গীত, ধর্মসভা ও অহোরাত্র তারক ব্রহ্ম মহানামযজ্ঞ। ষোড়শ প্রহরব্যাপী মহানাম যজ্ঞের শ্রীনামসুধা পরিবেশন করে মঞ্জুশ্রী সম্প্রদায়, মনোহর পাগল সম্প্রদায় ইত্যাদি। শ্রীশ্রী পুন্ডরিক বিদ্যানিধি স্মৃতি সংঘের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সকল ভক্ত জনের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

যুবকদের কৃষ্ণময় কর্মের অনুপ্রেরনা।

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত যুক্তরাজ্যের ইসকন মন্দিরের পান্ডবসেনা দলটি কৃষ্ণকর্ম অনুপ্রেরনাময়। এই বছর পান্ডবসেনা দলটি তাঁদের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করলেন। প্রতিষ্ঠাকালের প্রাক্কালে পান্ডবসেনাদের দীপ্ত ঘোষনা ছিল, যুক্তরাজ্যের ইস্‌কন মন্দির ছাড়াও ভক্তিবেদান্ত ম্যানর ও লন্ডনের আশপাশের মন্দিরগুলি রক্ষা করা।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে পান্ডব সেনাদের এই দলটি অসংখ্য যুবকদের কৃষ্ণভাবনামৃত কর্মের অনুপ্রেরনায় উজ্জীবিত করে তোলেন, যাঁদের বয়স পনের থেকে পচিঁশ।

যদিও পান্ডব গোষ্ঠির অধিকাংশ সদস্যই হচ্ছেন ব্রিটিশ-ভারতীয় গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত, তবে অন্যান্য জন-গোষ্ঠির সদস্য ও এই শাখাতে রয়েছেন। প্রায় নয় হাজার সদস্য বিশিষ্ট পান্ডব সেনাদের দলটি সারা পৃথিবীতে তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে থাকেন। সেইসব অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে–উৎসব, ছুটিকালীন অনুষ্ঠান, ঘরোয়া অনুষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি শতাধিক পান্ডব সেনাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। ●

কুইজ প্রতিযোগীতা

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর নিম্নরূপ ঃ

১। অর্জুন মহাশয়ের যুদ্ধ না করার ৫টি কারণ হলো ঃ
দয়া পরবশ হওয়া, সুখ ভোগ করা, পাপের ভয়, কুলক্ষয় জনিত, সহমর্মিতা।
২। জড় জগতের মায়ার ফাঁদ হলো - নিজেকে ভগবান বলে মনে করা।
৩। ভগবদ্ভক্তির ক্ষয় নেই, ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে সংসার রূপ মহাভয় থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায় চল্লিশ নং শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করা হয়েছে।
৪। ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ হলো - পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পন করা।
৫। জীব মানসিক জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করে, মন পবিত্র হয়ে আত্মাতেই পূর্ণতৃপ্তি লাভ করেন - ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ।

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তরদাতাদের মধ্য হতে বিজয়ী হলেন ঃ

প্রথম – সনজিতা ভট্টাচার্য্য, গ্রাম ঃ সুচক্রদন্ডী, পোঃ পটিয়া, চট্টগ্রাম।
দ্বিতীয় – শ্রীমতি প্রমীলা দেবী দাসী, প্রযত্নে ঃ জ্যোতি হোমিও হল, পোঃ +থানা ঃ রাজার হাট, কুড়িগ্রাম।

কুইজ প্রতিযোগীতার নিয়ম হলো ঃ প্রতিটি প্রতিযোগীতায়ই মোট ৫টি করে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া থাকিবে এবং প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর প্রদান করতে হবে। যারা প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হবেন, তাদের মধ্যহতে লটারির মাধ্যমে দু'জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
প্রথম বিজয়ীকে ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকাটি ২বৎসর এবং দ্বিতীয় বিজয়ীকে ১বৎসর বিনামূল্যে পাঠানো হবে।

চলতি সংখ্যায় প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে কিভাবে বলতে পারছিল ?
২। শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুত বলা হয়েছে কেন ?
৩। আত্মার উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ কি ?
৪। ভগবান কেন জীবের সঙ্গে থাকেন ?
৫। অর্জুন মহাশয়ের চারটি প্রশ্ন কি কি ?

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর আগামী ৩০শে জুন এর মধ্যে অবশ্যই 'অমৃতের সন্ধানে' ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

সম্পাদকীয়

নিজের আলয়ে ফিরে যেতে চান ?

বুদ্ধিমান লোকেরা জানতে চায়, "যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যাই তো কি লাভ হবে ?" এর পরম সুফল হল এই যে, সেখানে ভগবানের কাছে যেতে পারবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্ধামে জীবের যাওয়ার সুফল বর্ণনা করেছেন। সুফলটা হল এই- **"ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি"**। সেখানে গেলে এই জড় জগতে আপনাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। সুতরাং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের মস্ত বড় লাভ হল সেটাই। **পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি।**

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে বলেছেন-

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ (৮/১৫)

সেটাই হল জীবনের পরম সিদ্ধি। যাঁরা মহাত্মা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা ভগবানের কথা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করার ফলে এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে আবার জন্ম গ্রহণ করে না। কারণ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান যথার্থভাবে লাভ করলে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়।

সেই জন্য ভাগবতেও বলা হয়েছে-

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১/২/৬)

তাই আপনারা যদি ভগবদ্ধামে, নিজের আলয়ে ফিরে যেতে চান, তাহলে **'যতো ভক্তিরধোক্ষজে'** কথাটি বুঝতে হবে। আপনাকে এই পন্থা গ্রহণ করতে হবে, ভক্তির পন্থা। **'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।'** ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কর্মযোগ-জ্ঞানযোগের মাধ্যমে বোঝা যায় না। এই সমস্ত কোনও পন্থাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আপনাদের এই পন্থাটি গ্রহণ করতে হবে, যা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনুমোদন করেছেন-**'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।'**

এই কারণেই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা পরিবেশিত না হলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কোনও কিছুতে আগ্রহ প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়। কোনও পেশাদারী কৃষ্ণকথা প্রবচন পাঠদাতার কথা শুনতে নেই। সেটা একেবারেই নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনই ঐ ধরনের পাঠ-প্রবচনে প্রশ্রয় দিতেন না। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়বস্তু একমাত্র ভক্তিমার্গের মাধ্যমেই বুঝতে পারা যায়। **'যতো ভক্তিরধোক্ষজে'**। ভক্তিভাব ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হলে কৃষ্ণভক্তির পন্থাই মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। তারই জন্য সংগঠিত হয়েছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন, হরেকৃষ্ণ আন্দোলন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন।

ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন কোনও একটা তত্ত্বগত নিছক দার্শনিক ব্যাপার নয়। এটা অতি বাস্তব পদ্ধতি। 'যতো ভক্তিরধোক্ষজে।' আপনারা যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করতে চান, তবে জানবেন তার মধ্যে কোনও কাল্পনিক ব্যাপার নেই। আপনি একটা বাস্তব পদ্ধতির মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করছেন। পদ্ধতিটা হল,-

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্ ॥

এই ন'টি বিভিন্ন স্তরে ভক্তিমার্গে এগোতে হবে। **'স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাংঙ্মনোভিঃ'**- কেবল কৃষ্ণ নাম মনোযোগ দিয়ে ভক্তিভরে শুনতে হবে। যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন-আপনাকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে না। ব্যবসায়ী হন তো, ব্যবসায়ে থাকুন। ডাক্তার হন তো ডাক্তারী করুন। কিংবা উকিল, কিংবা যাই হোন না। সকল কাজের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন শ্রবণ করুন। এই পদ্ধতি স্বয়ং ব্রহ্মা নির্দেশ করেছেন এবং তা অনুমোদন করেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-**'স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ'**। যদি আপনি বসে বসে কেবল কৃষ্ণনাম শোনেন, শ্রুতিগতাং যদি আপনি সেই হরিনামের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির বাণী গ্রহণ করেন, তাহলে যেখানে আছেন, সেইখানে থেকেই লাভবান হবেন।

কিন্তু যদি কৃষ্ণনাম আর কৃষ্ণকথা শোনেন এবং বাস্তব জীবনে প্রতিপদে কৃষ্ণভক্তির পন্থা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে চলেন, তাহলে, যে পরমেশ্বর ভগবানের আর এক নাম হল **'অজিত'**-যাঁকে জয় করা যায় না-তাঁকেও একদিন আপনি জয় করতে সক্ষম হবেন। **'জিতোহপ্যসি'**-এটাই শাস্ত্রের অনুমোদিত পন্থা।

আর সেই জন্যই এই পন্থাটি হল অতি উত্তম ধর্ম চর্চার পন্থা। প্রত্যেকেই এটি গ্রহণ করতে পারেন। শুধুমাত্র কৃষ্ণনাম হরিনামের মহামন্ত্র আর কৃষ্ণভক্তিমূলক কথা শ্রবণ করা। আর সেই শ্রবণের পন্থাটিও প্রত্যেকের কাছে অতি সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন-নিজেই জপ করুন, নিজেই শুনুন। যে কোন জায়গাতেই যান, আপনি তা করতে পারেন। আপনি বাড়িতে বসে থাকুন, কিংবা আপনার অফিসে যান, আপনার কারখানায় যান, গাছের তলায় বা যেখানেই হোক বসুন-আর জপ করুন-

(১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে এক অদ্ভুত মন্দির নির্মিত হবে,
যেটি পাঁচশত বৎসর পুর্বে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীল জীব গোস্বামীকে অবগত করেন